মা'আরিফুল হাদীস

তৃতীয় খণ্ড

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র)

মাওলানা সাঈদুল হক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

তাহারাত (পবিত্রতা) অধ্যায়	২১-৮০
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার হাকীকত এবং ইসলাম ধর্মে এর স্থান	২১
পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ	২৪
অপবিত্রতার কারণে কবরে শাস্তি	২৭
পেশাব পায়খানার সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা	৩১
পায়খানায় প্রবেশের দু'আ	৩৭
পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসার পর দু'আ	৩৮
উযূ ঃ উযূর মাহাত্ম্য ও বরকত	৩৯
উযূ পাপ মোচনের মাধ্যম	৪০
উযূ জান্নাতের সকল দরজা উন্মোচনের চাবি	৪২
কিয়ামতের দিন উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে জ্যোতি চমকাবে	৪৩
কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা	৪৪
পূর্ণ গুরুত্বের সাথে উযূ করা ঈমানের লক্ষণ	৪৫
উযূ থাকা অবস্থায় পুনঃ উযূ করা	৪৬
অসম্পূর্ণ উযূর অশুভ প্রভাব	৪৬
মিস্ওয়াকের গুরুত্ব ও ফযীলত	৪৭
মিস্ওয়াক করার বিশেষ সময় ও স্থান	৪৯
মিস্ওয়াক করা আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত ও প্রকৃতির দাবি	৫০
সালাতের গুরুত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মিস্ওয়াকের প্রভাব	৫৪
সালাতের জন্য উযূর নির্দেশ	৫৫
উযূর নিয়ম	৫৭
উযূর সুন্নাত ও আদবসমূহ	৬১
উযূতে নিষ্প্রয়োজনে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার অনুচিত	৬৫
উযূর পর তোয়ালে বা রুমাল ব্যবহার করা	৬৫
প্রত্যেক উযূ শেষে আল্লাহ্র কিছু যিক্র ও সালাত আদায় করা	৬৬
অপবিত্রতা এবং অপবিত্রতার গোসল	৬৭
অপবিত্র ব্যক্তির গোসল পদ্ধতি ও আদব	৬৮
সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব গোসল	৭১
জুমু'আর দিনের গোসল	৭১
মৃতের গোসলদাতার গোসল	৭৩
ঈদের দিন গোসল	৭৪
তায়াম্মুম	৭৫

তায়াম্মুমের গুরুত্ব	৭৫
তায়াম্মুমের বিধান	৭৬
সালাত অধ্যায়	**৮১-৮৩**
الله اكبر। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ	৮১
সালাতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য	৮১
সালাত বর্জন ঈমানের পরিপন্থী এবং কুফরী কাজ	৮৩
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়া এবং তা আদায়কারীকে ক্ষমা করার অঙ্গীকার	৮৭
সালাত পাপ মোচন এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম	৮৮
সালাতের বিনিময়ে জান্নাত ও মাগফিরাতের অঙ্গীকার	৯০
হতভাগ্যদের জন্য আফসোস	৯০
সালাত সর্বাধিক প্রিয় আমল	৯১
সালাতের সময়সমূহ	৯১
মাগরিবের সময় প্রসঙ্গে	১০০
ইশার সময় প্রসঙ্গে	১০০
ফজরের সময় প্রসঙ্গে	১০২
শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় প্রসঙ্গ	১০৪
নিদ্রা কিংবা ভুলের কারণে সালাত কাযা হলে করণীয়	১০৬
আযান	১০৭
ইসলামে আযানের শুভ সূচনা	১০৭
আবূ মাহযূরা (রা) কে আযান শিক্ষাদান	১১৩
আযান ও ইকামতে দীনের মৌলিক শিক্ষা ও দাওয়াত নিহিত	১১৬
আযান ও ইকামত সম্পর্কীয় কতিপয় নির্দেশ	১১৭
আযান এবং মু'আয্যিনের মর্যাদা	১২০
মসজিদ	১২৭
মসজিদের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব, আদব ও হক	১২৭
মসজিদে প্রবেশের ও বের হওয়ার দু'আ	১৩২
তাহিয়্যাতুল মসজিদ	১৩৩
মসজিদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ঈমানের লক্ষণ	১৩৪
মসজিদ পরিষ্কার করা এবং সুগন্ধময় করে রাখা	১৩৫
মসজিদের নির্মাণের সাওয়াব	১৩৫
মসজিদের বাহ্যাড়ম্বর ও শান-শওকত অপসন্দীয়	১৩৬
দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু আহার করে মসজিদে আসা নিষেধ	১৩৭
মসজিদে কবিতাবাজি এবং ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ	১৩৮
অবোধ শিশু ও হট্টগোল ইত্যাদি থেকে মসজিদ মুক্ত রাখা	১৩৯

মসজিদে দুনিয়ার কথা বলা নিষেধ	১৩৯
মসজিদে মহিলাদের সালাত আদায়ের অনুমতি	১৪০
জামা'আত	১৪৩
জামা'আতের গুরুত্ব	১৪৪
জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত ও বরকত	১৪৭
জামা'আতের নিয়্যাতের মধ্যে জামা'আতের পূর্ণ সাওয়াব নিহিত	১৪৯
কোন্ অবস্থায় জামা'আতে সালাত আদায় করা জরুরী নয়	১৪৯
জামা'আতে সালাত আদায়কালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান	১৫১
কাতার সোজা করার গুরুত্ব এবং তাকিদ	১৫২
সর্বাগ্রে প্রথম কাতার পুরা করা	১৫৫
প্রথম কাতারের ফযীলত	১৫৫
কাতারের বিন্যাস পদ্ধতি	১৫৬
ইমাম মাঝিমাঝি স্থানে দাঁড়াবেন	১৫৭
মুক্তাদী একজন কিংবা দু'জন হলে কিভাবে দাঁড়াবে?	১৫৭
নারীদেরকে পুরুষের এমনকি বালকদের পেছনে দাঁড়াতে হবে	১৫৮
ইমামত	১৫৯
ইমামতির ক্ষেত্রে উপযুক্ততার বিন্যাস	১৫৯
নিজেদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করবে	১৬১
ইমামের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা	১৬২
ইমাম কর্তৃক মুক্তাদীর প্রতি লক্ষ্য রাখা	১৬২
মুক্তাদীর প্রতি নির্দেশক	১৬৫
সালাত কীরূপে আদায় করবে?	১৬৬
রাসূলুল্লাহ্ (স) কিভাবে সালাত আদায় করতেন ?	১৬৮
কতিপয় বিশেষ যিক্র ও দু'আ	১৭১
সালাতে কিরা'আত পাঠ	১৭৬
সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত	১৭৮
ফজরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্(সা)-এর কিরা'আত	১৮০
যুহর ও আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কিরা'আত	১৮৪
মাগরিবের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কিরা'আত	১৮৫
ইশার সালাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কিরা'আত	১৮৬
রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিভিন্ন সালাতে পঠিত কিরা'আত	১৮৮
জুমু'আ ও দুই ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিরা'আত	১৯০
সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলা	১৯২
'আমীন' কি সশব্দে না নিঃশব্দে পাঠ করতে হবে	১৯৪

রাফি' ইয়াদাঈন (সালাতে হাত উত্তোলন)	১৯৫
রুকূ ও সিজ্‌দা	১৯৮
ভালভাবে রুকূ ও সিজ্‌দা আদায় করার গুরুত্ব	১৯৯
রুকূ ও সিজ্‌দায় কী পাঠ করবে?	২০১
রুকূ ও সিজ্‌দায় কুরআন পাঠ করবে না	২০৫
সিজ্‌দার ফযীলত	২০৬
সালাতের কিয়াম ও বৈঠক	২০৭
বৈঠক, তাশাহ্‌হুদ ও সালাম	২১১
বৈঠকের সঠিকও সুন্নাত নিয়ম	২১১
প্রথম বৈঠক হবে সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত	২১৩
তাশাহ্‌হুদ	২১৪
দুরূদ শরীফ	২১৬
দুরূদ পাঠের হিক্‌মত	২১৬
দুরূদ ও সালামের ফলে শিরক সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়	২১৭
আল-কুরআনে দুরূদ ও সালামের নির্দেশ	২১৭
"দুরূদ শরীফের 'আ-ল' (آل) শব্দের তাৎপর্য	২২০
সালাতে দুরূদ শরীফের স্থান ও তার হিক্‌মত	২২১
দুরূদের পর এবং সালামের পূর্বে পঠিতব্য দু'আ	২২২
সালাতের সমাপনী সালাম	২২৫
সালামের পর যিক্‌র ও দু'আ	২২৭
সুন্নাত ও নফল সালাতসমূহ	২৩৩
দিন রাতের সুন্নাতে মু'আক্‌কাদ সালাতসমূহ	২৩৪
ফজরের সুন্নাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ এবং এর ফযীলত	২৩৫
ফজর ব্যতীত অপরাপর ওয়াক্তের সুন্নাত ও নফল সালাত সমূহের ফযীলত	২৩৭
বিতরের সালাত	২৩৯
সালাতুল বিত্‌রের কিরা'আত	২৪২
সালাতুল বিত্‌রে দু'আ কুনূত পাঠ করা	২৪২
বিত্‌রের পর দুই রাক'আত নফল সালাত	২৪৫
কিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদ সালাতের ফযীলাত ও গুরুত্ব	২৪৬
রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) নিষ্পাপ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর গুনাহ ও ক্ষমা প্রসঙ্গে	২৫০
তাহাজ্জুদ সালাতের কাযা ও তার প্রতি বিধান	২৫১
রাসূলুল্লাহ্‌ (স) কত রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন?	২৫২
রাসূলুল্লাহ্‌ (স) তাহাজ্জুদ সালাতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ	২৫৩
চাশ্‌ত অথবা ইশরাকের সালাত	২৫৯

বিশেষ সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নফল সালাতসমূহ	২৬৩
সালাতুল ইসতিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনার সালাত)	২৬৩
সালাতুল হাজাত (প্রয়োজন পূরণের সালাত)	২৬৪
ইস্তিখারার সালাত	২৬৬
সালাতুত্‌ তাসবীহ্‌	২৬৮
সালাতুত তাসবীহ্‌'র প্রভাব ও বরকত	২৭১
নফলের এক বিশেষ উপকারিতা	২৭১
উম্মাতে মুসলিমার বিশেষ প্রতীক ও সামষ্টিক সালাত জুমু'আ ও দুই ঈদের সালাত	২৭২
জুমু'আ বারের মাহাত্ম্য ও ফযীলত	২৭৪
জুমু'আ বারের বিশেষ আমল হল দুরূদ শরীফ	২৭৪
ইন্‌তিকালের পর নবী কারীম (স.)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ এবং হায়াতুন্নবী প্রসঙ্গ	২৭৫
জুমু'আর দিনে রহমত প্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে	২৭৬
জুমু'আর সালাত ফরয হওয়া এবং তা আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ	২৭৭
জুমু'আর সালাত আদায়ের গুরুত্ব এবং তা আদায়ের নিয়ম	২৭৯
জুমু'আর দিন ক্ষৌরকর্ম করা এবং নখ কাটা	২৮০
জুমু'আর দিন উত্তম পোশাক পরিধানের প্রতি গুরুত্বারোপ	২৮১
প্রথম ওয়াক্তে জুমু'আর সালাতে যাওয়ার ফযীলাত	২৮১
জুম'আর সালাত ও খুতবা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (স.)-এর আমল	২৮২
জুমু'আর (ফরয) সালাতের পূর্বের ও পরের সালত	২৮৩
ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা	২৮৫
দুই ঈদের উৎপত্তি	২৮৭
ঈদের সালাত ও খুতবা	২৮৮
বিনা আযান ও ইকামাতে দুই ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত	২৮৮
দুই ঈদের সালাতের আগে কিংবা পরে কোন সুন্নাত সালাত নেই	২৯০
দুই ঈদের সালাতের সময়	২৯০
দুই ঈদের সালাতে কিরা'আত	২৯১
বৃষ্টি কারণে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা	২৯২
দুই ঈদের খাবার ঈদগাহে গমনের আগে না পরে?	২৯৩
ঈদগাহে যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাস্তা পরিবর্তন করা	২৯৪
সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায়ের সময় এবং এর হিক্‌মত	২৯৪
ঈদুল আযহার কুরবানী (পশু যবাই)	২৯৫
কুরবানী করার নিয়ম	২৯৭
কুরবানীর পশু সম্পর্কে দিক নির্দেশনা	২৯৮

বড় পশু কয়ভাগে কুরবানী করা যাবে?	২৯৯
ঈদের সালাতের পরেই কুরবানী করার সময়	৩০০
১০ ই যিলহজ্জের ফযীলত ও সম্মান	৩০১
সূর্যগ্রহণের সালাত এবং বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত	৩০২
সূর্যগ্রহণের সালাত	৩০২
বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত (সালাতুল ইস্তিস্কা)	৩০৮
জানাযার সালাত এবং তার আগে ও পরে করণীয়	৩১২
মৃত্যুর স্মরণ এবং তার আকাঙ্খা	৩১৩
মৃত্যু কামনা করা এবং এর জন্য দু'আ করা নিষেধ	৩১৬
রোগ ব্যাধি মু'মিনের জন্য রহমত এবং পাপের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)	৩১৭
রোগাক্রান্ত থাকলে সুস্থ থাকাকালীন আমলের সাওয়াব লাভ	৩২০
রোগীর সেবা করা, সান্ত্বনা দেওয়া ও সমবেদনা প্রকাশ করা	৩২০
রোগীর উপর ফুঁক দেওয়া এবং তার আরোগ্য লাভের জন্য দু'আ করা	৩২২
মৃত্যুর লক্ষণ স্পষ্ট হলে করণীয় কী?	৩২৪
মৃত্যুর পর করণীয় কী?	৩২৬
মৃতের জন্য কান্নাকাটি, উচ্চস্বরে বিলাপ ও মাতম করা	৩২৭
চোখের পানি বের হওয়া এবং অন্তরে ব্যাথা অনুভব করা	৩৩১
মৃতের পরিবারের লোকদের আহারের বন্দোবস্ত করা	৩৩২
কারো মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ এবং তার প্রতিদান	৩৩৩
নবী করীম (স.)-এর একটি শোকগাঁথা এবং ধৈর্যের উপদেশ	৩৩৩
মৃতের গোসল ও কাফন	৩৩৫
কাফনে কয়টি কাপড় হবে এবং তা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়?	৩৩৭
জানাযার (লাশের) পেছনে পেছনে যাওয়া এবং জানাযার সালাত আদায়ের সাওয়াব	৩৩৯
জানাযার পেছনে দ্রুত চলা এবং তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ	৩৪১
জানাযার সালাত এবং মৃতের জন্য দু'আ	৩৪১
জনাযার সালাতে অধিক সংখ্যক লোক সমাবেশের বরকত এবং গুরুত্ব	৩৪৪
লাশ দাফনের রীতিনীতি ও তার আদাব	৩৪৫
কবর সম্পর্কে (নবী করীম এর) পথ নির্দেশ	৩৪৮
কবর যিয়ারত	৩৪৯
মৃতদের জন্য ইসালে সাওয়াব	৩৫১

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম মানব জাতির জন্য যেমন চিরন্তন ও সার্বজনীন জীবন দর্শন, তেমনি ইসলামের বাস্তব নমুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবতার জন্য অনুপম আদর্শ। তাঁর পবিত্র ও সুন্দরতম জীবন চরিত, যা পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'খুলুকুন আযীম', ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণরূপে হাদীস হিসেবে বিশ্ব মানবতার হিদায়েত ও মুক্তির জন্য আমাদের মাঝে সংরক্ষিত। হাদীস হলো নবী করীম (সা)-এর পূত-পবিত্র চরিত্রের কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়েত ও নসীহতের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত আলোকবর্তিকা; মানব জীবনের সকল অঙ্গন সম্পর্কে এতে দিক-নিদের্শনা বিদ্যমান। এ সোনালী ধারা না থাকলে আমাদের জীবন পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে যেত। মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমত, তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য তাঁর প্রিয় নবীর এ হাদীসকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখার ব্যবস্থা নিয়েছেন। উম্মাতের উলামায়ে কিরাম যুগ যুগ ধরে এ হাদীস চর্চা ও সংকলন এবং সংরক্ষণের জন্য বিরাট দায়িত্ব আনজাম দিয়ে আসছেন।

উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মনযুর নু'মানী (র) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, রাসূলের প্রতি ঈমান এবং এ ধরনের আকীদাগত বিষয় থেকে শুরু করে মানবীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড, মৃত্যু, হাশর-নশর পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়কে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ এর আওতায় সন্নিবেশিত করে উর্দূ ভাষায় 'মা'আরিফুল হাদীস' নামে একটি সংকলন প্রণয়ন করেন। আট খণ্ড বিশিষ্ট এই মূল্যবান রচনা বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এ হাদীস সংকলনটি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম খণ্ড ইতোমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাভাষী ধর্মপ্রাণ মুসলিম পাঠক ভাইবোনদের হাতে এ মূল্যবান হাদীস সংকলনের তৃতীয় খণ্ডটি তুলে দিতে পারায় আমরা মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন!

এ. জেড. এম শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ পবিত্র কুরআনের তাফসীর, সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ ও বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ-গবেষকদের রচিত মূল্যবান পুস্তকসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ বিভাগ থেকে ইতোমধ্যে তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইব্ন কাছীর ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীসহ বেশ অনেক মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

'মা'আরিফুল হাদীস' শীর্ষক হাদীস সংকলনটি বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মনযূর নু'মানী (র) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় সংকলিত। এতে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো থেকে শুরু করে মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী জীবন, পার্থিব জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম এবং এমনকি শিষ্টাচার, দয়া প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলী পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় অনুচ্ছেদ আকারে এতে এতদসংশিষ্ট হাদীসমূহ এর আওতায় সন্নিবেশ করেছেন এবং হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও এতে সংযোজিত হয়েছে। কাজেই একজন মুসলমানের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাত সম্পর্কে জানার জন্য এ সংকলনটি অত্যন্ত উপযোগী।

মোট আট খণ্ডে সমাপ্ত এ হাদীস সংকলনটি প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করা হলো। এর পরবর্তী' খণ্ডও দ্রুত প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ খণ্ডটি অনুবাদ করছেন বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক, সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান এবং প্রুফ দেখেছেন জনাব এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম। আল্লাহ্ তাদেরকে এবং প্রিয় রাসূল (সা)-এর হাদীস প্রকাশনা-কর্মের সাথে জড়িত সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রথম প্রকাশহেতু কিছু মুদ্রণজনিত ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এ ধরনের কোন ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের স্বার্থে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিজ্ঞ পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

গ্রন্থকারের ভূমিকা

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

ইসলাম তথা কোন ধর্মেই নবী-রাসূল ব্যতীত হিদায়াত লাভের বিষয়টি চিন্তাও করা যায় না। কারণ সৎপথের দিশা সম্বলিত নির্দেশিকা নবী-রাসূলের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। আর তাঁরাই আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেন, এর মৌলিক নীতিমালার ব্যাখ্যা দেন এবং বিধি-বিধানের বাস্তব রূপ দান করেন। এ পর্যায়ে যে সকল প্রশ্নের উদ্ভব হয় তাঁরা তার সমাধান পেশ করেন। তাই হিদায়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ কেন্দ্রীয় ও বুনিয়াদী সত্তারূপে স্বীকৃত এবং তাঁরাই মানুষের হিদায়াতের উৎস। কাজেই তাঁদের উপর ঈমান আনা, আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রতিনিধিরূপে মান্য করা মুক্তি ও সৌভাগ্য অর্জনের পূর্ব শর্ত। বর্তমান কালে বরং খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবতার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী ও রাসূল। তিনি সর্বশেষ নবী হওয়ার তাৎপর্য এই যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের সময় কাল। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথে সন্ধান দিয়েছেন সে পথই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। তাই কুরআন মাজীদে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - قُلْ اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ -

"বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বলুন, আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পসন্দ করেন না।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১-৩২)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর অনুপম সুন্দর চরিত্রের অনুসরণ করার মধ্যে যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমগ্র মানবতার মুক্তি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের শর্ত, তাই দু'টি উপায়ের একটি অবলম্বন আবশ্যক ছিল, হয় তাঁকে জগৎ বিলয় না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখতে হত যাতে মানুষ সরাসরি তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখে তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করতে পারে, নয়ত তাঁর অনুপম শিক্ষা এবং তাঁর মহত্তম চরিত্রের ঘটনাবলীর এমনভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক ছিল যাতে অনাগত কালের লোকজন তাঁর শিক্ষা ও হিদায়াত লাভে ধন্য হতে পারে। যেমনিভাবে তাঁর জীবদ্দশায় লোকেরা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে হিদায়াত লাভ করেছিলেন।

কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দুনিয়াতে জীবিত রাখা আল্লাহ্ তা'আলার হিক্‌মত পরিপন্থী হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর তা হচ্ছে একদিকে তিনি হিদায়াতের উৎসরূপে তাঁকে যে আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছেন তা হুবহু সংরক্ষণ করে রেখেছেন। ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ অমুসলিম ব্যক্তিবর্গও এর অভিনব সংরক্ষণের ব্যাপারটি অকপটে স্বীকার করেন। অন্যদিকে তাঁর পবিত্র জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবিস্তার হিদায়াতনামা, তাঁর নির্দেশনামূলক বাণী ও ভাষণ, তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ড এবং মহত্তম চরিত্র তথা তাঁর গোটা জীবন যা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সমৃদ্ধ এবং তাঁর হিদায়াত ও শিক্ষা-দীক্ষারও বাস্তব নমুনা স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা তা নবীজীর উম্মাতের দ্বারা হাদীস সংকলন ও গ্রন্থায়ন করিয়ে এমনভাবে মু'জিযারূপে সংরক্ষণ করে রেখেছেন যে চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁর নবুওয়াতী জীবন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে; যেন তিনি স্বকীয় সত্তা নিয়ে এ দুনিয়ার আজও বিদ্যমান আছেন। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি তাঁর হাদীস ভাণ্ডারের দিকে তাকায় এবং যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে ঈমানী সম্পর্ক থাকে, তবে সে গভীরভাবে অনুভব করবে যে, হাদীসের আয়নায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পুরো জীবন প্রতিফলিত হচ্ছে। সে দেখতে পায় যে, তিনি উঠাবসা করছেন, চলাফেরা করছেন, হাসছেন, সালাত আদায় করছেন লোক সমক্ষে ভাষণ দিচ্ছেন, আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করছেন এবং তাতে অঝোর ধারায় চোখের পানি ফেলছেন, ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ করছেন, হজ্জে তাওয়াফ ও সাঈ করছেন, কুরবানী করছেন ও মাথা মুণ্ডন করছেন, মসজিদের বারান্দায় ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করছেন অপরাধীদের শাস্তি বিধান করছেন এবং রণাঙ্গনে মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্বে দিচ্ছেন। আর এসব অবস্থায়ই সে তার অন্তরের কান দিয়ে তাঁর বাণী শুনতে পাবে। প্রকাশ্যও সাধারণ সমাবেশ ছাড়াও একান্ত

পরিবেশেও নবীজীর এমন অন্তরঙ্গ বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হবে যা তার নিকটাত্মীয় এমনকি পিতামাতা সম্পর্কেও জানতে পারে না।

কিছুদিন আগের কথা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শিক্ষা ও তাঁর গোটা জীবন দর্শন সংরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে স্বদেশীয় এক বিখ্যাত অমুসলিম ব্যক্তির কতিপয় বিভ্রান্তিকর ও জ্ঞান বর্জিত কথার জবাব দিতে গিয়ে আমি বলেছিলাম আমার বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ বছর তখন আমার সম্মানিত পিতা ইন্‌তিকাল করেন। বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার আমি আমার সম্মানিত পিতার কাছে ছায়ার ন্যায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছি। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি যে, হাদীসের মাধ্যমে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যতটুকু জানতে পেরেছি, ততটুকু আমার সম্মানিত পিতা সম্পর্কে জানতে পারি নি। আল্লাহ্‌র শোকর, আমার বিশ্বাস আমি একথা ভুল বলি নি।

সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট থেকে ঈমানী সম্পদ লাভ ছাড়াও তাঁর সাথে গভীর ভালবাসাও প্রীতির ডোরে আবদ্ধ ছিলেন। ফলে তাঁরা তাঁর কাছে যা শুনতেন এবং যা কিছু তাঁকে করতে দেখতেন তা মুখস্থ করে রাখতেন এবং গভীর আগ্রহ ভরে আলোচনা করতেন। এটা ছিল প্রকৃত ঈমান ও ভালবাসার অনিবার্য দাবি। তাঁরা এটাকে নিজেদের গুরু দায়িত্ব, সৌভাগ্য এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে মনে করতেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা, বিশেষত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল আ'স (রা) তাঁর বাণীসমূহ লিখে রাখার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।১

তারপর যে সকল লোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানা পান নি বরং তাঁর সাহচর্য-ধন্য সাহাবা কিরাম এর সাক্ষাৎ পান তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে পুরো অংশই লাভ করেন। উল্লেখ্য খুলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গণ্য হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর সযত্ন তত্ত্বাবধানে হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে প্রণয়নের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়।২

ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী, হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র)-এর ন্যায় খ্যাতিমান তাবিঈ হাদীস গ্রন্থাকারে রচনার কাজ শুরু করেন। এর পর তাঁদের ছাত্রদের মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে।

---

১. খলীফা উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) মদীনার গভর্নর আবূ বাকর ইব্‌ন হায্‌মকে লক্ষ্য করে লিখেছেন ঃ

انظر ماكان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস তালাশ করে লিখে নিবে কেননা আমি ইল্‌ম ও উলামার বিলুপ্তির আশঙ্কা করি"।

ঐ সময় বিরচিত কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম মালিক (র) মুওয়াত্তা আজ পর্যন্ত প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। তিনি ছাড়াও অনেক হাদীস বিশারদ বহু হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও তা আজ পর্যন্ত গ্রন্থরূপে আমাদের সামনে বর্তমান নেই, কিন্তু পরবর্তীকালের সংকলনসমূহে তা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকে।

পরবর্তীকালে ইমাম আবদুর রায্যাক, ইমাম ইব্ন আবু শায়বা, ইমাম আহ্মাদ এবং হাফিযুল হাদীস হুমাইদী (র)-এর ন্যায় শত শত হাদীস বিশারদ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে একাজকে আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যান।

উপরিউক্ত হাদীস বিশারদগণের পর ইমাম বুখারী (র) ইমাম মুসলিম (র) এবং সুনান প্রণেতাদের যুগ শুরু হয়। তাঁদের সংকলিত সিহাহ্ সিত্তাহ (হাদীসের ছয়খানা বিশুদ্ধ কিতাব) আজও আমাদের সামনে সংকলন বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরপর তাঁদের সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে শত শত গ্রন্থ রচিত হয় এবং হাদীস বর্ণনা, গ্রন্থবদ্ধ ও সংরক্ষণকরণ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর সাথে সাথে বর্ণনাকারীদের সমালোচনা মূলগ্রন্থও বিরচিত হতে থাকে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে চল্লিশ হাজারের অধিক বর্ণনাকারীর জীবন চরিত সম্বলিত 'আসমাউর রিজাল' নামে এক স্বতন্ত্র বিষয় গড়ে উঠে এবং তা গ্রন্থাগারের রূপ নেয়।

হাদীস রচনার পাশাপাশি হাদীস থেকে মূলনীতি সনাক্তকরণ এবং আহকাম চিহ্নিত করণের কাজ চলতে থাকে, ইমাম মালিক (র) যাঁর শুভ সূচনা করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখের গ্রন্থরাজিতে নমুনা লক্ষ্য করা যায়। ইমাম বুখারী (র)-এর 'তারজিমে আবওয়াব' এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

এরপরের শতাব্দীর প্রত্যেক শুভ সন্ধিক্ষণেই উম্মাতের আলিমগণ এই বিশাল হাদীস ভাণ্ডার থেকে পৃথক পৃথক খিদ্মত আঞ্জাম দিয়ে এ শাস্ত্রকে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধকরণের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে সব সময়ই আলিমগণ এ বিষয়ের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এর ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টিকা)

২. সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হাদীস লিখে রাখতেন। মুসনাদে আহ্মাদ ও সুনানে আবূ দাউদে স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে হাদীস লেখার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।

আমাদের বর্তমানকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বেশির ভাগ মানুষের চিন্তা-চেতনা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারণা ব্যাপক প্রসার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। তাই বিংশ শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে বর্তমান সময়ের আলিমগণ কর্তৃক এই ধ্যান ধারণার পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতির ঢেউ লাগে, তখন নবী কারীম ﷺ -এর শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী রূপদানের লক্ষ্যে আল্লাহ্র মেহেরবানীতে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর ঐ কাজ আঞ্জাম দানকারীদের জন্য তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" আজো আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমার (গ্রন্থকার) মনে হয় হাদীস ও সুন্নাহর ব্যাপারে এই যুগে মানব মনের খোরাক রূপে এই গ্রন্থে যে উপকরণ বিদ্যমান আছে পুরো ইসলামী গ্রন্থাগারেও এর ন্যায় অনবদ্য দ্বিতীয় একটি গ্রন্থ পাওয়া যাবে না।

এ অধম (গ্রন্থকার) যেহেতু বিংশ শতাব্দীর এবং বিশেষত এই যুগের চিন্তাধারা সামনে রেখে হাদীসের ভাষ্য লেখার কাজ শুরু করেছি, যার ধারাবাহিকতায় এই তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, এই ভাষ্য রচনা করতে যেয়ে এ অধম "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" থেকে সবচাইতে বেশী উপকৃত হয়েছি।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) তাঁর এই অনবদ্য গ্রন্থে হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্ম নিরূপণে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ গ্রন্থ পাঠে এই যুগের মানুষের জ্ঞান পিপাসা সহজেই মিটে যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ গ্রন্থের আলোকে ফিক্হবিদ ও মুজতাহিদগণের মতবিরোধজনিত বিষয়ে চমৎকার সমাধান পাওয়া যায়। ফলে দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ হয়ে যায় যে, এযেন সকল ইমামের সকল ফিক্হী মাসআলার একটি কুদরতী বৃক্ষের শাখা অথবা একটি বড় নদী থেকে প্রবাহিত স্রোতধারাসমূহ যে গুলোর উৎস একই এবং তা পরস্পর বিরোধী হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, এই মহান ওলীর মূল্যবান গ্রন্থরত্ন আজও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান পায় নি, অথচ আমাদের বর্তমান যুগে উক্ত গ্রন্থখানা আল্লাহ্র একটি বিশেষ নি'আমত স্বরূপ।

মা'আরিফুল হাদীসের এই তৃতীয় খণ্ডটি তাহারাত (পবিত্রতা) ও সালাত অধ্যায় সম্বলিত। এতে পাঠক এমন সকল হাদীস পাঠ করতে পারবেন যাতে ফিক্হবিদদের বিভিন্ন মাসআলায় মত পার্থক্যের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অধম (গ্রন্থকার) এমন মাস'আলা ও হাদীসের ব্যাখ্যা দান কল্পে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর গৃহীত মৌলিক নীতিমালা গ্রহণ করেছি।

এই খণ্ডের সংশ্লিষ্ট কিছু জরুরী কথা

মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডে ঈমান ও আখিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর ও আত্মার পরিশুদ্ধি এবং চরিত্র সংশোধনের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ স্থান পেয়েছে আর তৃতীয় খণ্ডে ইসলামের ইবাদাতসমূহের তথা সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, যিক্‌র আযকার ও দু'আর সমন্বয়ে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে পাঠকদের সামনে পেশ করার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহারাত ও সালাত অধ্যায় সন্নিবেশিত করতে নিয়ে গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচশ'র কাছাকাছি পৌঁছার ফলে তাহারাত ও সালাত অধ্যায় আলোচনা করে এই খণ্ডের সমাপ্তি টানা হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ চতুর্থ খণ্ডে স্থান পাবে। অনুমান করা যাচ্ছে যে, ঐ খণ্ডের কলেবর অনুরূপ হবে।

মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডটি ১৩৭৩ হিজরী এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৩৭৬ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তৃতীয় খণ্ডটি এক বিশেষ বাধার কারণে প্রায় আট বছর পর এখন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী খণ্ড সম্পর্কে আমি একান্তভাবে আশাবাদী যে, আগামী বছর তা পাঠকদের খিদমতে পেশ করতে পারব ইনশা আল্লাহ্।

তাহারাত (পবিত্রতা) অধিকাংশ ইবাদত, বিশেষত সালাতের ক্ষেত্রে শর্তরূপে স্বীকৃত। তাই অধিকাংশ হাদীস বিশারদের রীতি এই যে, তাঁরা যখনই হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন তখন সালাত সহ অপরাপর বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের পূর্বে প্রথমে তাহারাত সংক্রান্ত হাদীসের স্থান দেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন আমি এই খণ্ডে হাদীস বিশারদগণের অনুসরণ তাহারাত অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অনধিক সত্তরটি হাদীস পেশ করেছি। এরপর সালাত অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩৫১ টি হাদীস সন্নিবেশিত করেছি। এসব হাদীস সন্নিবেশিত ও নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে আমাকে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে হয়েছে। হাদীস গবেষক এবং বর্তমান সময়ে যাঁরা ইল্‌ম ও দীনের দাবি পূরণের ক্ষেত্রে সচেতন তাঁরা চিন্তা করলে দেখতে পাবেন যে, হাদীসের অনুবাদ ও ভাষ্য ছাড়াও এতে একটি স্বতন্ত্র গবেষণামূলক কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী দুই খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও হাদীসের অনুবাদ ও ভাষ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে এই হাদীসসমূহ অনুসরণের ক্ষেত্রে আমাদের এই সময়ের লোকদের মনে প্রবল আবেগ সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারা তাঁরা যেন সাহাবা কিরামের ন্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার জ্যোতি লাভ করতে পারেন। তাই

ইচ্ছাকৃতভাবে নিছক ইল্‌মী, বিষয়ভিত্তিক ও পাঠ্যসূচি কেন্দ্রিক আলোচনা পরিহার করা হয়েছে।

তাই অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় মনে দাগকাটার মত হাদীসের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা এবং প্রয়োজনে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

'আমীন' এবং 'রাফি' ইয়াদাঈন' এর সব পার্থক্য জনিত মাস'আলার ক্ষেত্রে পাঠক যাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা মানসিক পেরেশানী থেকে রক্ষা পান এবং তর্কযুদ্ধে লিপ্ত না হন তার সম্ভাব্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এসব মাস'আলার মধ্যে যা ঠিক ও যথার্থ তা কেবল আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আর যা কিছু ত্রুটিপূর্ণ তা এই অধমের জ্ঞানের অপূর্ণতারই ফসল।

প্রথম দুই খণ্ডের ন্যায় বেশির ভাগ হাদীস আমি 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্' থেকে চয়ন করেছি এবং মূলত এ গ্রন্থের উপরই সর্বাধিক নির্ভর করেছি। এতে আমি এ পদ্ধতিও অবলম্বন করেছি যে, যে হাদীস সহীহ্ বুখারী অথবা মুসলিম থেকে চয়ন করা হয়েছে তা অপরাপর কিতাবে থাকা সত্ত্বেও বরাত দানের ক্ষেত্রে সহীহ্ বুখারী অথবা সহীহ্ মুসলিমের নাম উল্লেখ করেছি। কেননা কোন হাদীস এতদুভয় গ্রন্থের যে কোন একটি সূত্রে উল্লেখ করছি উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। কিছু সংখ্যক হাদীস 'জামউল ফাওয়ায়িদ' থেকেও এবং কিছু সংখ্যক কানযুল উম্মাল থেকেও চয়ন করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে কানযুল উম্মালের বরাত উল্লেখ করেছি। কিছু সংখ্যক হাদীস বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সমূহ যেমন সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, জামি' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ ইত্যাদি থেকে চয়ন করেছি। তবে এসবের বরাত দানকালে উক্ত গ্রন্থ সমূহের নাম উল্লেখ করেছি। যেহেতু মিশকাত কিংবা জামউল ফাওয়ায়েদে সেগুলোর উল্লেখ নেই।

প্রথম দুই খণ্ডের ভূমিকায়ও আমি এসব কথাই লিখেছি যে, মা'আরিফুল হাদীস রচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দীনের দাওয়াত এবং হাদীস সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ, তাই হাদীসের শব্দ বিন্যাসের ব্যাকরণগত দিক এবং শাব্দিক অনুবাদের অনুসরণ অত্যাবশ্যক মনে করা হয়নি। বরং হাদীসের উদ্দেশ্য ও বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার প্রতিই লক্ষ্য করা হয়েছে। আর এদিকে লক্ষ্য করেই কোন কোন হাদীসকে পূর্বাপর করা হয়েছে।

পাঠকদের খিদমতে লেখকের শেষ আরয বা ওয়াসীয়্যাত

প্রথম দুই খণ্ডেও যেরূপ ভূমিকা পেশ করেছি। এখানেও ঠিক তাই করতে চাচ্ছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ পাঠ করে জ্ঞান রাজ্যের চৌহদ্দী বাড়ানোই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বরং তাঁর সাথে ঈমানী ও আমলী

যিন্দেগীর সম্পর্ক স্থাপন করে হিদায়াত প্রাপ্তি ও আমলের নিয়্যাত করাও অত্যাবশ্যক। হাদীস পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি গভীর ভালবাসা অন্তরে স্থান দেয়া উচিত এবং হাদীস এমনভাবে পাঠ করা উচিত যে, যেন আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মজলিসে উপস্থিত রয়েছি। তিনি যেন বাণী প্রদান করেছেন আর আমরা তা শুনছি। যদি আমরা এ পন্থা অবলম্বন করি, তবে ইনশা আল্লাহ্ অন্তরে ঈমানী নূর কিছু না কিছু নসীব হবেই যেমন নবী-যুগের লোকদের ভাগ্যে জুটেছিল এবং যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট থেকে ঈমানী ও আধ্যাত্মিক দৌলত লাভের তাওফীক দান করেছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ্র নিকট ভুলভ্রান্তি ও গুনাহ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ্র রহমত এবং তাঁর বান্দাদের দু'আর মুখাপেক্ষী অধম গুনাহগার

১ রমাযানুল মুবারক ১৩৮৪ হিজরী
৫ জানুয়ারী ১৯৬৫

মুহাম্মদ মানযূর নু'মানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাহারাত (পবিত্রতা) অধ্যায়

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার হাকীকত এবং ইসলামে এর স্থান

ইসলামের দৃষ্টিতে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, কা'বাঘর তাওয়াফ ইত্যাদি ইবাদাত আদায়ের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন কেবল অত্যাবশ্যক শর্তই নয় বরং কুরআন হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, তা দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে। কুরআন মাজীদে তাই তো ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।" (২ সূরা বাকারা ঃ ২২২)

কুবা পল্লীতে বসবাসকারী মু'মিনদের প্রশংসায় কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

" সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জনকে ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন।" (৯ সূরা তাওবা ঃ ১০৮)

উল্লিখিত আয়াত দু'টি থেকেই বুঝা যায় ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব কত বেশী। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম ক্রমিকে সহীহ্ মুসলিমের বর্ণিত হাদীসখানার অংশ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ এর শাব্দিক অনুবাদেই এরূপ ইংগিত রয়েছে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন ইসলামের একটি বিধান মাত্র নয় বরং ধর্মের ও ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে।

অন্যান্য হাদীসে একে "ঈমানের অর্ধেক" বলেও উল্লেখ রয়েছে।

আমাদের মুহ্তারাম উস্তাদ শায়খুল মাশায়িখ হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ্(র) এর একটি মূল্যায়ন এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এ কথার হাকীকত বুঝিয়েছেন যে, কল্যাণ লাভের রাজপথ হল শরী'আত, যার দিকে আহবান করার লক্ষ্যে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছে। এর (শরী'আত) অনেক শাখা রয়েছে এবং প্রত্যেক শাখার শত শত প্রশাখা রয়েছে। কিন্তু একে মোটামুটি চারটি শিরোনামে একত্র করা যেতে পারে। যথা ১. তাহারাত (পবিত্রতা). ২. বিনয় ৩. উদারতা ৪. ন্যায়নিষ্ঠা"।

এরপর শাহওয়ালী উল্লাহ (র) প্রত্যেকটির হাকীকত বর্ণনা করেছেন যা গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, নিঃসন্দেহে সমগ্র শরী'আতকে এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।

আমি এখানে শাহ সাহেব (র)-এর কেবল সে প্রসঙ্গই আলোচনা করব যাতে তিনি পবিত্রতার হাকীকত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"কোনো সুস্থ মননের ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার মানুষ যার অন্তর পাশবিকতার দাবি পূরণ করেনি এবং তাতে জড়িয়েও পড়েনি, সে যখন কোনভাবে অপবিত্র হয়ে পড়ে চাই তা পেশাব পায়খানা দ্বারা হোক কি স্ত্রী সম্ভোগ দ্বারা সে নিশ্চয়ই নিজের মধ্যে এক প্রকার সংকোচ, রুচিহীনতা, মালিনতা, গ্লানি এবং অস্বচ্ছতা অনুভব করবে। তারপর যদি সে পেশাব পায়খানা সেরে নেয় এবং ভালভাবে ইস্‌তিন্‌জা ও উযু করে অথবা যদি সে স্ত্রী সম্ভোগ করে গোসল করে নেয় এবং ভাল কাপড় চোপড় পরে নেয় এবং সুগন্ধি মাখে তবে সে সংকোচ গ্লানি ও অস্বচ্ছতা থেকে সহসা মুক্ত হতে পারে। এছাড়াও সে তার নিজ স্বভাবে প্রবল আনন্দও অনুভব করে। সুতরাং বলা যায়, উপরে বর্ণিত দুই অবস্থার প্রথমটি অপবিত্রতা এবং দ্বিতীয়টি পবিত্রতা নামে পরিচিত। মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি সুস্থ স্বভাব ও প্রকৃতির অধিকারী, সে এ দুই অবস্থার মধ্যেকার ব্যবধান পরিষ্কারভাবে অনুভব করে এবং স্বভাবের দাবি হিসেবে অপবিত্রতা অপসন্দ করে এবং পবিত্রতা পসন্দ করে।"

"মানুষের এই পবিত্রাবস্থার সাথে আল্লাহর ফিরিশতাদের সাথে রয়েছে কতই না অপূর্ব মিল। কারণ তাঁরা সর্বদা অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও জ্যোতির্ময় অবস্থায় দিন কাটান। তাই সর্বক্ষণ পবিত্রাবস্থায় থাকা মানুষকে এনে দেয় ফিরিশতা সুলভ মাহাত্ম্য। ফলে মানুষ ও উর্ধ্ব জগতে অবস্থানকারীদের (নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিশতাদের) থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন অপবিত্র অবস্থায় বিচরণ করে তখন তার সাথে শয়তানের অপূর্ব মিল লক্ষ্য করা যায়। আর তখন তার মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণা গ্রহণের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। ফলে তার অন্ধকারের গভীর কুঠরীতে তলিয়ে যায়।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর উল্লিখিত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, অপবিত্রতা ও পবিত্রতা মানুষের আত্মিক ও সহজাত দু'টি অবস্থার নাম। আমরা যে সকল বস্তুকে নাপাকী এবং পবিত্রতা বলি তা প্রকৃতপক্ষে তার কারণসমূহ মাত্র এবং শরী'আত এই কারণসমূহের উপরই বিধান আরোপ করে এবং তা নিয়ে আলোচনা করে।

আশা করা যায় যে, তাহারাতের হাকীকত এবং মানবাত্মার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে হযরত শাহ সাহেব (র)-এর এই ভাষ্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে। এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, পবিত্রতা গোটা শরী'আতের এক চতুর্থাংশ বটে।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থের অন্য একস্থানে তাহারাতের বিধান এবং এর তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"তাহারাত তিন প্রকার। যথা - ১. অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়া অর্থাৎ যে সকল অবস্থায় গোসল অথবা উযূ ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব ঐ সকল অবস্থায় গোসল অথবা উযূ করে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান অপবিত্রতা এবং নাপাকী থেকে শরীর, কাপড় চোপড় বা কোন স্থানকে পবিত্র করা এবং ৩. শরীরের যে সকল স্থান থেকে দুর্গন্ধময় বস্তু অথবা ময়লা বের হয়–তা পরিষ্কার করা, যেমন. দাঁত পরিষ্কার করা, নাকের ময়লা পরিষ্কার করা, নখ কাটা এবং নাভীর নিচের চুল কর্তন করা।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, তাওরাত অধ্যায় , ১ম ২য় খণ্ড, পৃ.১৭৩)

নিম্নে সে সব হাদীস উপস্থাপিত হবে তার কিছু অংশ হবে সাধারণভাবে তাহারাতের সাথে সংশ্লিষ্ট যা উল্লিখিত তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আর কিছু অংশে ঐ তিন প্রকারের কোন এক প্রকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই ভূমিকার পর তাহারাত সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীস পাঠ করা যায়।

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

١- عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلأَنِ اَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَّالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَّالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَّالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا - رواه مسلم

১. হযরত আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাহারাত-পবিত্রতা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। আল-হামদু লিল্লাহ্ আমলের পাল্লা ভরে দেয় এবং সুবহানাল্লাহ্ ও আল-হামদু লিল্লাহ্ পাল্লা ভরে দেয়, কিংবা রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। সালাত হচ্ছে নূর বা আলো, দান-সাদাকা হচ্ছে দলীল, ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি, কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেকে ভোর উঠে আপন আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে, ফলে সে হয় নিজের মুক্তিদাতা কিংবা ধ্বংসকারী। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ স্পষ্টতই এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ভাষণ। এতে তিনি দীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করেছেন। এর প্রথম অংশ — اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الاِيْمَانِ পবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণেই হাদীস গ্রন্থ সমূহের তাহারাত অধ্যায়ে এ হাদীসে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বক্ষ্যমান হাদীসে উদ্ধৃত " شطر " শব্দের অর্থ 'অর্ধেক'। কেননা এ মর্মে ইমাম তিরমিযী (র) সূত্রে অন্য একটি হাদীসে شطر শব্দের স্থলে نصف অর্থাৎ الطهور نصف الايمان (তাহারাত ঈমানের অর্ধেক) বলে বর্ণনা করেছেন।[১], কিন্তু আমার (গ্রন্থকার) মতে, شطر ও نصف শব্দদ্বয়ের অর্থ হচ্ছে তাহারাত ও পবিত্রতা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তাতেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কাজেই এর বেশী বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

১. জামে তিরমিযী, দাওয়াত অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতার গুরুত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ্র তাসবীহ্ ও তাহ্মীদের সাওয়াব এবং ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তাসবীহ্ অর্থাৎ 'সুবহানাল্লাহ্' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের দৃঢ়-বিশ্বাসের প্রকাশ ও সাক্ষ্যদান যে আল্লাহ্র সত্তা অত্যন্ত পবিত্র এবং তাঁর জন্য যা অশোভন ও অসমীচীন তা থেকে তিনি পবিত্র।

তাহ্মীদ অর্থাৎ 'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের দৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা ও সাক্ষ্য দান যে সার্বিক কল্যাণ ও মাহাত্ম্যের জন্য যাঁর প্রশংসা করা যায় তিনি কেবল সেই আল্লাহ্ তা'আলারই পবিত্র সত্তা। আর এজন্যেই সার্বিক প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। উল্লেখ্য যে তাসবীহ্ ও তাহ্মীদ আল্লাহ্র নিষ্পাপ ফিরিশ্তাদের বিশেষ ওয়াযীফা। কুরআন মাজীদে ফিরিশতাদের যাবানেই তার প্রমাণ মিলে— " نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ " (আমরাই তো তোমার স্তুতিগান ও সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি)। সুতরাং দু'টি বাক্য মানুষের জন্য ও উত্তম ওয়াযীফা বিবেচিত হতে পারে। কারণ সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টার স্তুতি ও গুণগানে মানুষের নিরত থাকা চাই। তাই তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ্' মানুষের আমলের পাল্লা ভরে দেয়। সুবহানাল্লাহ্র সাথে যদি 'আল-হামদুল্লিাহ্' মিলিয়ে পাঠ করা হয় তবে উভয়ের জ্যোতিতে আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী অংশ আলোকময় হয়ে ওঠে। 'সুবহানাল্লাহ্' বলায় আমলের পাল্লা ভরে যাওয়া এবং 'সুবহানাল্লাহ্ ও আল-হামদু লিল্লাহ্' একত্রে বলায় আসমান-যমীন জ্যোতির্ময় হওয়ার মর্ম সম্পর্কিত উপলব্ধি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাদের দান করেন এবং আসমান-যমীন পূর্ণ জ্যোতি কেবল তাঁদের সামনেই ভেসে উঠে। আমাদের মত সাধারণ লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন তার উপর অবিচল আস্থা রাখা এবং কাজে পরিণত করে উপকৃত হওয়া উচিৎ। তাস্বীহ ও তাহ্মীদের ফযীলত অনুপ্রেরণা দান করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের ব্যাপারে বলেন, 'সালাত আলো সদৃশ'। পৃথিবীতে সালাতের কার্যকর বৈশিষ্ট্যর বহিঃপ্রকাশ হয় তার বরকতে অন্তরে জ্যোতি সৃষ্টি হবার মধ্য দিয়ে। কাজেই যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে সালাত আদায় করে সে অন্তরে তা অনুভব করে। আর এ জ্যোতির প্রভাবে যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারে। তাই তো কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ "সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।" (২৯ সূরা আনকাবূত ঃ ৪৫)

আখিরাতের বিভিন্ন মনযিলে সালাতের জ্যোতির প্রভাব এমনি হবে যাতে অন্ধকারের ঘনঘটা দূর হয়ে যাবে আর জ্যোতি মুসল্লীর সাথী হবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

"তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে।" (৬৬ সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৮)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দান খায়রাত সম্পর্কে বলেন যে, এটা হচ্ছে প্রমাণ স্বরূপ । এ দুনিয়ায় দান সাদাকা প্রমাণ হওয়ার মর্ম হচ্ছে এটা প্রমাণ করে যে দাতা একজন মু'মিন ও মুসলিম। কারণ তাঁর অন্তরে যদি ঈমান না থাকত তবে নিজের উপার্জন থেকে দান করা তার পক্ষে কোন সহজ ব্যাপার ছিলনা। কেননা—

"گرزر طلبی سخن دریں است" "যদি সোনা চাও তবে তাতে কথা বলার আছে।" আখিরাতে এ বৈশিষ্টের প্রকাশ ঘটবে এভাবে যে, একনিষ্ঠদাতার দান খায়রাতকে তাঁর ঈমানের ও আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী হওয়ার প্রমাণরূপে গ্রহণ করে। তাঁকে পর্যাপ্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ধৈর্য সম্পর্কে বলেন ঃ ধৈর্য হচ্ছে এক প্রকার জ্যোতি। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিম সালাত ও সাদাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে এখানে 'সবর' এর অর্থ করেছেন সিয়াম। কিন্তু এই অধমের (গ্রন্থকার) মতে গ্রহণযোগ্য অভিমত হল, সবর বা ধৈর্য শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে 'সবর' এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি সত্তাকে আল্লাহ্‌র আইনের অধীন করা এবং এ পথের যাবতীয় দুঃখ যাতনা ভোগ করতে থাকা। তাই এখানে 'সবর' অর্থ হচ্ছে, নিজেকে পুরোপুরি দীনের মধ্যে প্রবিষ্ট করা। এতে সালাত, দান-সাদাকা, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ছাড়াও আল্লাহ্‌র এবং তাঁর দীনের বিধান পালনের ক্ষেত্রে সর্ববিধ কষ্ট মেনে নেয়া এবং নিজ প্রবৃত্তিকে প্রদমিত রাখা, এসব বিষয়ই এর আওতাভুক্ত। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন, 'সবর জ্যোতি সদৃশ'। কুরআন মাজীদে চাঁদের আলোকে 'নূর' এবং সূর্যের আলোকে 'যিয়া' বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا "তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চাঁদকে জ্যোতির্ময় করেছেন।"(১০ সূরা ইউনুস ঃ ৫)

সবর ও সালাত থেকে নির্গত জ্যোতির সম্পর্ক হবে সূর্য ও চাঁদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক রয়েছে অনুরূপ। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরআন মাজীদ সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ "কুরআন মজীদ হয় তোমাদের পক্ষে, নয় তোমাদের বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে।" একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআন মাজীদ আল্লাহ্‌র বাণী ও তাঁর পথনির্দেশ। সুতরাং এর

সাথে যদি তোমাদের ভাল সম্পর্ক থাকে এবং তোমরা যদি তার অনুসারী হও যেমনটি মু'মিনের ঈমানের দাবি, তাহলে তা হবে তোমাদের পক্ষে প্রমাণ আর বিপরীত হলে তা হবে তোমাদের বিপক্ষে প্রমাণ।

উল্লিখিত সতর্কবাণী ও অনুপ্রেরণামূলক বাণী প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীসের শেষাংশে ইরশাদ করেন ঃ 'এ দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ব্যস্ততার মাঝে দিন কাটায় এবং সে প্রত্যহ নিজ সত্তাকে বেচাকেনা করে। কখনো তা তাকে মুক্তি দেয়, আবার কখনো তা তাকে ধ্বংসের মুখোমুখি করে। এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, মানব জীবন একজন ব্যবসায়ীর ধারাবাহিক বেচাকেনার সাথে তুলনীয়। যদি সে আল্লাহ্‌র ইবাদাত এবং সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তবে সে নিজ জীবনের জন্য উত্তম বস্তুই উপার্জন করল এবং তার মুক্তির পথ সুগম করল। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে সে যদি প্রবৃত্তির দাস হয় আল্লাহ্‌কে ভুলে জীবন অতিবাহিত করে, তবে সে নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনে এবং নিজকে জাহান্নামী করে তোলে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব তাৎপর্যের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর এই সতর্কবাণী ও অনুপ্রেরণা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন।

অপবিত্রতার কারণে কবরে শাস্তি

٢. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لاَ يَسْتَنْزِهُ) مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا ، فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا – رواه البخارى و مسلم

২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন ঃ জেনে রেখ এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তবে কোন বিরাট ব্যাপারে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না অর্থাৎ এ থেকে বিরত থাকা কোন কঠিন কাজ ছিল না। তাদের একজনের গুনাহ ছিল এই যে, যে পেশাব কালে আড়াল করত না। (মুসলিমের বর্ণনায় আছে পেশাব থেকে পবিত্র হতো না) আর অপর জনের গুনাহ ছিল এই

যে, সে চোগলখুরী করে বেড়াত। এর পর তিনি খেজুরের তাজা একটি শাখা আনালেন। তারপর তা দু'টুক্‌রা করে উভয় কবরের উপর একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবা কিরাম আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন একাজ করলেন? তিনি বললেন ঃ সম্ভবত এদের শাস্তি কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন এ তাজা শাখা দু'টো না শুকাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কবরের শাস্তি সম্পর্কে মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডে নীতিগত আলোচনা হয়েছে। সেখানে যে সব হাদীস পেশ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, কবরের শাস্তির শব্দ পার্শ্ববর্তী প্রাণীরা শুনতে পায়, কিন্তু মানুষ ও জিন তা শুনতে পায় না। এর কারণ যথাস্থানে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কবরের শাস্তির শব্দ শুনতে পাওয়ার ঘটনা পূর্বেই বিধৃত হয়েছে। উক্ত হাদীসে যেমন একটি ঘটনার বিবরণ এসেছে, তদ্রুপ এ হাদীসেও দ্বিতীয় একটি ঘটনার বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণের এমন সব অদৃশ্যের সংবাদ অবহিত করান এবং অদৃশ্য বিষয়ের শব্দ শুনান যা সাধারণ মানুষ চোখে দেখতে পায় না। এবং তাদের কান শুনতেও পায় না। বলাবাহুল্য এটি এ ধরনেরই একটি ঘটনা।

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে দু'ব্যক্তির শাস্তি হওয়ার কারণ রূপে পৃথক পৃথক গুনাহের বিষয় বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে চোগলখুরী করে বেড়াত, যা একটি গুরুতর চারিত্রিক অপরাধ। কুরআন মাজীদের এক স্থানে একে কাফির অথবা মুনাফিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ –

"যে কথায় কথায় শপথ করে, তুমি তার অনুসরণ করো না, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী,যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে দেয়।" (৬৮ সূরা কালাম ঃ ১০-১১)

কা'ব ইব্‌ন আহ্‌বার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে চোগলখুরীকে সর্বাধিক বড় গুনাহরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে,[১] অপর ব্যক্তির শাস্তির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ সে পেশাবের অপবিত্রতা থেকে নিজেকে রক্ষা করত না ও পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে অসতর্ক থাকত। (لا يستتر ولا يستنزه সে পেশাবকালে আড়াল করত না অথবা পবিত্র হত না উভয়ের অর্থ প্রায় একই।)

১. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী (র) কৃত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উদ্ধৃত।

সহীহ্ বুখারীর এক বর্ণনায় "لا يستبرئ" (সে পবিত্র হত না) শব্দ এসেছে। বলাবাহুল্য, এ শব্দ থেকে জানা যায় যে, প্রস্রাবের অপবিত্রতা বা এ ধরনের অন্য অপবিত্রতা থেকে নিজের শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখার চেষ্টা করা আল্লাহ্‌র নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া এবং অসাবধানতা অবলম্বন কবরে শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে বিবেচিত।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তাজা খেজুরের শাখা আনালেন এবং তা দু'টুকরা করে উভয় কবরে এক টুকর করে পুঁতে দেন।

কোন সাহাবী এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ "আশা করা যায়, এ টুকরা দু'টি যতদিন তাজা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের কবরে শাস্তি লাঘব করা হবে।"

হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যায় কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন ঃ কোন তাজা শাখা যতদিন তাজা থাকে ততদিন তা প্রাণবন্ত থাকে এবং তা আল্লাহ্‌র গুণ-কীর্তনে রত থাকে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ "এমন কোন কিছুই নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না"। (১৭, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪) উল্লিখিত ভাষ্যকারদের মতে, এ হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে এরূপ ঃ "প্রত্যেক বস্তুই আজীবন আল্লাহ্‌র সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এরপর যখন এ সব বস্তুর জীবনাবসান ঘটে তখন সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষাণারও পরিসমাপ্তি ঘটে। বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত ভাষ্যকারগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর বাণীর ব্যাখ্যা এ রূপ করেন ঃ তিনি তাজা খেজুরের শাখা কবরে এ জন্য পুঁতে রাখেন যাতে তার তাসবীহ্ ও তাহ্‌মীদ পাঠে শাস্তি খানিকটা লাঘব হয়। খেজুরের শাখা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কবরের শাস্তি হাল্‌কা হওয়ার তিনি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তার ভিত্তি হচ্ছে এই। কিন্তু অধিকাংশ ভাষ্যকার এ ব্যাখ্যাকে সঠিক নয় বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ব্যাখ্যা আমাদের নিকটও ভুল প্রতীয়মান হয়। কেননা প্রত্যেক জ্ঞানবান লোক যদি খানিকটা খতিয়ে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণে কবরের উপর তাজা খেজুরের শাখা দু'টুকরা করে পুঁতে দিননি। কারণ তা দু'চার দিনের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। ব্যাপারটি যদি তাই হতো, তবে তিনি এমন কিছু পুঁতে দিতেন যা বছরের পর পছর ধরে তাজা থাকত। উল্লিখিত ব্যাখ্যা ভুল হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সাহাবা কিরাম যদি অর্থই বুঝতেন তবে সচরাচর তাই করতেন এবং সকল কবরে তাজা ডাল পুঁতে দিতেন বরং বৃক্ষ রোপন রীতিমত প্রথায় পরিণত হয়ে যেত অথচ ব্যাপারটি তা হয়নি।

মোটকথা নবী করীম ﷺ-এর একাজের উক্ত ব্যাখ্যা নির্ঘাত ভুল। এ সূত্র ধরে সুধি বুযুর্গদের কবরে ফুলের মালা পেশ করার শিরকী প্রথার বৈধতা আবিস্কার করা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ভাবধারার উপর গুরুতর আঘাত স্বরূপ।

তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর এ কাজের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এই যে, তিনি সংশ্লিষ্ট কবরবাসীর শাস্তি লাঘবের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন। তারপর যেন এর জবাবে তাঁকে একটি তাজা ডাল দ্বিখণ্ডিত করে কবরে পুঁতে দেয়ার কথা জানানো হয় এবং এও অবহিত করা হয় যে, যতদিন তা তাজা থাকবে ততদিন কবরবাসীর শাস্তি খানিকটা লাঘব করা হবে। সহীহ্ মুসলিমের শেষ দিকে হযরত জাবির (রা) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতেও দু'টি কবরের কথা উল্লেখ আছে। তবে এটি একটি পৃথক ঘটনা। উক্ত হাদীসে হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ নবী করীম ﷺ আমাকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাঁর কাছে দু'টি বৃক্ষের দু'টি শাখা কেটে আনি। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। তারপর যখন আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ ওখানে দু'টি কবরে শাস্তি হচ্ছে। আমি তাদের শাস্তি লাঘব করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ মর্মে ওহী করেন যে, যতদিন তাজা শাখা না শুকাবে ততদিন তাদের শাস্তি হাল্কা রাখা হবে। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে তাজা কোন শাখার মধ্যে শাস্তি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ আপনার দু'আয় এ সময় পর্যন্ত কবরের শাস্তি হাল্কা করা হল। সুতরাং বলা চলে, মূল বিষয় ছিল নবী কারীম ﷺ-এর দু'আ এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত কবরে শাস্তি হাল্কা করার ফয়সালা।

কিছু সংখ্যক ভাষ্যকার নবী কারীম ﷺ যে কবর দু'টির উপর তাজা খেজুর শাখা প্রোথিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন উক্ত কবরবাসীদ্বয় মুসলিম ছিল না অমুসলিম? এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। গ্রহণযোগ্য মত হলো, দু'টি কবরের অধিবাসীই মুসলমান ছিলেন।

এর একটি ইঙ্গিত এ হাদীসেই বিদ্যমান রয়েছে। চোগলখুরী ও পেশাবের ব্যাপারে অসতর্ক থাকার কারণে কবরে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যদি এ কবর দু'টি কোন কাফিরের হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শাস্তির কারণ হিসাবে একথা না বলে তাদের কুফর ও শিরকের কারণে শাস্তির কথা বলতেন। এছাড়াও মুসনাদে আহ্মাদে আবূ উসামা (রা) সূত্রে বর্ণিত, একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ কবর দু'টি জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত ছিল। আর তিনি জান্নাতুল বাকী অতিক্রমকালে উক্ত কবর দু'টিতে শাস্তি হওয়ার বিষয় অনুভব করেন। একথা

সর্বজন বিদিত যে, মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত 'জান্নাতুল বাকী' মুসলমানদেরই কবরস্থান। মোটকথা এসব বিবেচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উক্ত কবর দু'টি ছিল দু'জন মুসলমানের।

এ হাদীসের বিশেষ শিক্ষা হচ্ছে এই যে, পেশাব পায়খানার অবিত্রতা থেকে পবিত্র থাকার ব্যাপারে সযত্ন দৃষ্টি রাখা চাই এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীর ও কাপড় চোপড় পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে পূর্ণ সচেষ্ট থাকা জরুরী। চোগলখুরীর মত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড থেকে ও নিজেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় দু'টি ব্যাপারে অসতর্কতার কারণে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। আল্লাহ্ আমাদের হিফাযত করুন।

পেশাব পায়খানার সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَاَمَرَ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ - رواه ابن ماجه والدارمى

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্য পুত্রের জন্য পিতা সদৃশ। যেভাবে একজন পিতা তার সন্তানের কল্যাণ কামনায় জীবনের নিয়মনীতি ও আদব শিক্ষা দেন ও তেমনি আমি তোমাদের শিক্ষা দান করি। আমি তোমাদের এ শিক্ষাও দিয়ে থাকি যে, তোমরা পায়খানা করার সময় কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে বসবে না অর্থাৎ কিব্লার দিকে মুখ বা পিঠ ফিরে বসবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ইসতিন্জার জন্য তিনটি ঢেলা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন আর শুক্না গোবর টুকরা ও হাড় দ্বারা ঢেলা নিতে নিষেধ করেছেন। তিনি ডানহাত দিয়ে পায়খানা নেশাব পরিষ্কার করতেও নিষেধ করেছেন। (ইব্ন মাজাহ ও দারেমী)

٤. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهٗ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ - رواه مسلم

৪. হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার কাফিরদের তরফ থেকে বিদ্রুপ ছলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমাদের নবী তোমাদের সব কিছু শিক্ষা দেন এমনকি পেশাব পায়খানার পদ্ধতিও ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে পেশাব পায়খানার সময় কিব্‌লামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে, তিনটি ঢেলার কম দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে এবং গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে নিষেধ করেছেন । (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ পানাহার যেমন মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক তেমনি পেশাব মানুষের একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। নবী কারীম ﷺ যেমন মানব জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি পেশাব-পায়খানা থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়ে সমীচীন অসমীচীন তথা জায়িয না জায়িয ইত্যাদি বিষয়ের দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। উল্লিখিত দু'টি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

১. পেশাব পায়খানা করার সময় এমনভাবে বসা চাই যাতে কিব্‌লার দিক সামনে কিংবা পিছনে না থাকে। এ হচ্ছে কিব্‌লার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদব ও দাবী। প্রত্যেক বিবেকবান সচেতন ব্যক্তির কাছেই পেশাব পায়খানা করার সময় কিব্‌লার মত কোন পবিত্র জিনিস সামনে কিংবা পেছনে রাখা শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ বলে বিবেচিত হয়।

২. ডান হাত সাধারণত পানাহার, লেখা, কোন কিছু ধরা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। ডানহাত জন্মগতভাবে বামহাতের তুলনায় অধিক শক্তিশালী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কাজেই তা ইস্‌তিনজা কালে অপবিত্রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যবহার না করাই উচিত। বিষয়টি এরূপ যে, প্রত্যেক সচেতন ভদ্র ব্যক্তিই শৈশবে তার সন্তানদের এ শিষ্টাচার ও ভদ্রোচিত পদ্ধতি রপ্ত করানো অত্যাবশ্যক মনে করে।

৩. দিক নির্দেশনা হচ্ছে এই যে, ইস্‌তিনজা থেকে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে কমপক্ষে তিনটি ঢেলা ব্যবহার করা চাই। কেননা সাধারণভাবে তিনটি ঢেলার কমে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। তবে কেউ যদি তিনের অধিক ঢেলা ব্যবহার করে, তাতে দোষের কিছু নেই। উল্লেখ্য, হাদীসে ইস্‌তিনজার জন্য পাথর-ঢেলার কথা বলা হয়েছে, তা বিশেষত আরবদের ব্যবহার বিধির দিকে লক্ষ্য করে। নতুবা পাথর ব্যবহার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। মাটির ঢেলা হোক বা এমনি ধরনের কোন বস্তু যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় তাই মূল উদ্দেশ্য। পাথর ব্যতীত অপরাপর ব্যবহারোপযোগী বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা অসমীচীন হবে না।

৪. চতুর্থ দিক নির্দেশনা হচ্ছে এই যে, কোন জীব-জন্তুর হাড় কিংবা শুক্‌না গোবর দ্বারা ইস্‌তিনজা থেকে পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন মিটানো উচিত নয়। যদিও জাহিলিয়্যা যুগে আরবরা দু'টি বস্তু পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) দু'টি বস্তু দ্বারা ইস্‌তিনজা করা থেকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। মোটকথা হল দু'টি বস্তু দ্বারা ইস্‌তিনজা করা প্রত্যেক ভদ্র ও রুচি সম্পন্ন মানুষের কাছে অশোভন বিবেচিত হয়।

٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّاَ - رواه أبو داؤد

৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী কারীম ﷺ যখন ইস্‌তিনজা করতে যেতেন, আমি ওখন তাঁর জন্য কাঁসার বা পাথরের পাত্রে আবার কখনো চামড়ার পাত্রে পানি এগিয়ে দিতাম। তিনি তা দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করতেন। অতঃপর মাটিতে হাত ঘষে নিতেন। এরপর আমি আরো একপাত্র পানি দিলে তিনি তারা দ্বারা উযূ করতেন। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যাঃ উল্লিখিত হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেশাব-পায়খানা থেকে পাথর কিংবা অন্য কোন বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের পর আবার পানি দ্বারা পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করতেন। তারপর হাত মাটিতে ঘষে ধুয়ে নিতেন। এরপর আবার উযূও করে নিতেন। বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর ইস্‌তিন্‌জা ও উযূর পানি সরবরাহ করার সৌভাগ্য আমরাই হতো। তবে বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার বিশেষ দায়িত্ব আনাস (রা)-এর উপরও অর্পিত ছিল।

আলোচ্য হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের পর নবী করীম ﷺ উযূ করে নিতেন। তবে এ উযূ যে ফরয ও ওয়াজিব ছিল না বরং উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বুঝাবার জন্য তিনি কখনো কখনো এ ধরনের উযূ বর্জনও করতেন। সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে ইব্‌ন মাজাহ্ গ্রন্থে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেশাবের কাজ সেরে নেন এবং উমার (রা) উযূর পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি পানি গ্রহণ না করে বরং বললেন ঃ হে উমার! কেন তুমি পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে? উমার (রা) বললেন ঃ আপনার উযূর পানি নিয়ে আমি প্রতীক্ষা করছি। তিনি বললেন ঃ পেশাব করলেই উযূ করতে হবে, এরূপ আমি আদিষ্ট নই। কারণ আমি যদি এ কাজ অব্যাহত রাখি, তবে তা উম্মাতের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

এ হাদীস থেকে এও বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাস'আলার সঠিক স্বরূপ নিজ কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য এবং স্বীয় উম্মাতের ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য কখনো কখনো উত্তম বিষয়টি পরিহার করে চলেছেন।

٦- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَاَنَسٍ اَنَّ هٰذِهِ الاٰيَةُ لَمَّا نَزَلَتْ : «فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ» قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الاَنْصَارِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَثْنٰى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا اَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ --- رواه ابن ماجة

৬. হযরত আবূ আইউব, জাবির ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ কু'বার মসজিদ সম্পর্কে যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -

"সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পসন্দ করেন" (১০, সূরা তাওবা ঃ ১০৮)

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আনসারগণ! এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমাদের সে পবিত্রতা কি? তাঁরা বললেন ঃ আমরা সালাতের জন্য উযূ এবং অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে গোসল এবং পানি দ্বারা ইস্তিনজা করে থাকি অর্থাৎ ঢেলা ব্যবহারের পর পানিও ব্যবহার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ কারণ এটাই। সুতরাং তোমরা অবশ্যই সর্বদা একাজ করবে। (ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ আরবের বেশির ভাগ লোক কেবল ঢেলা ও পাথর কনা দ্বারা ইস্তিনজা করাকেই যথেষ্ট মনে করত। আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আরবরা সাদাসিধে খাবার খেত এবং তাদের যথেষ্ট শক্তি থাকায় তাদের পায়খানা উটের বিষ্ঠার ন্যায় শুকনা হতো, এজন্য ইস্তিনজার কাজে তাদের পানি প্রয়োজন হতো না। তারা কেবল পাথর কনা দিয়ে ইস্তিনজা করাকে যথেষ্ট মনে করত। কিন্তু আনসারগণ ইস্তিন্জার কাজে পাথর কনা ব্যবহারের পর পানিও ব্যবহার করতেন। তাঁদের এহেন পবিত্রতা অর্জনের প্রশংসা করে কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে একাজ অব্যাহত রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। বলাবাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আমলও ঠিক এরূপই ছিল। কুরআন মাজীদ এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী ও আমল মুসলিম

উম্মাতকে এ দিক নির্দেশনা দেয় যে, কারো শুকনা পায়খানা হওয়ায় তা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ঢেলা কিংবা পাথর কনা যদি যথেষ্ট মনে করা হলেও পানি দ্বারা ইস্তিনজা করে নেয়া এবং মাটিতে হাত ঘষে নেয়া উচিত। কারণ এটাই প্রশংসনীয় পরিচ্ছন্নতার দাবি এবং আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় পদ্ধতি।

٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اتَّقُوْا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ فِىْ ظِلِّهِمْ - رواه مسلم

৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দু'টি অভিশাপের কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবা কিরাম আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! সে কাজ দু'টি কি? তিনি বললেন ঃ মানুষের চলার পথে অথবা ছায়াযুক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা করা। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের সারকথা হচ্ছে এই যে, মানুষের চলার পথে অথবা ছায়াযুক্ত স্থান--যেখানে মানুষ খানিকটা বিশ্রাম করে, এমন স্থানে যদি কেউ পেশাব পায়খানা করে তাতে মানুষের ভীষণ কষ্ট হয় এবং মানুষ উক্ত ব্যক্তিকে গালমন্দ করে এবং অভিসম্পাত দেয়। সুতরাং এহেন মন্দকাজ পরিহার করা উচিত। সুনানে আবূ দাউদে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে মানুষের চলার পথ ও ছায়াযুক্ত স্থান ব্যতীত তৃতীয় একটি কথারও উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছে, পানি প্রাপ্তিস্থান, যেখানে মানুষের আনাগোনা আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এর বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঘর-বাড়ী ব্যতীত অন্য স্থানে কারো পেশাব-পায়খানার বেগ হলে সে যেন এমন স্থান বেছে নেয় যেখান দিয়ে মানুষ চলাচল করে না যাতে মানুষকে কষ্টেরও শিকার হতে না হয়।

٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتّٰى لَايُرَاهُ اَحَدٌ - رواه ابو داؤد

৮. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব-পায়খানা করতে চাইলে এমন স্থানে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায় । (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব স্বভাবে লজ্জা- শরম, শরাফত ও ভদ্রতার যে গুণাবলী দান করেছেন তার অনিবার্য দাবি হচ্ছে, কারো যদি প্রকৃতির কাজ সেরে

নিতে হয়, তবে সে যেন লোক চক্ষুর আড়ালে যায়, চাই তাকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হোক না কেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল এবং তাঁর মহান শিক্ষা।

٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبُوْلَ دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ - رواه أبوداؤد

৯. হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি নবী করীম ﷺ এর সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করতে একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম নিচু জায়গায় চলে গেলেন এবং অতঃপর পেশাব করলেন। এরপর বললেনঃ তোমাদের কেউ পেশাব করতে চাইলে সে যেন উপযুক্ত জায়গায় খুঁজে নেয়। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ পেশাব পায়খানার কাজ সম্পাদনের জন্য এমন জায়গা খুঁজে নেয়া উচিত যেখানে পর্দা রক্ষিত হয়, যেখানে পেশাবের ছিটা গায়ে না পড়ে এবং দিক সনাক্ত করার ক্ষেত্রে বিভ্রাট না ঘটে।

আল্লাহ্র অগণিত রহমত ঐ মহান নবীর উপর বর্ষিত হোক যিনি তাঁর উম্মাতকে পেশাব পায়খানার শিষ্টাচারও শিক্ষা দিয়েছেন।

١٠- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ - رواه أبو داؤد

১০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলের জায়গায় পেশাব করে সেখানে গোসল কিংবা উযূ না করে। কেননা অধিকাংশ সন্দেহ (ওয়াস্ওয়াসা) এসব বিষয় থেকেই সৃষ্টি হয়। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ কোন মানুষ যদি গোসলখানায় পেশাব করার পর সেস্থানে গোসল কিংবা উযূ করে, তা হবে নির্ঘাত শিষ্টাচার বিবর্জিত কাজ। কারণ এহেন কাজের একটি খারাপ পরিণতিও রয়েছে। তা হলো এতে পেশাবের ছিটা লাগার সম্ভাবনা থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী শেষাংশ থেকে বুঝা যায় যে, গোসলখানায় পেশাব করার পর গোসল কিংবা উযূ করা হলে যদি তার ফোটা

শরীরে কিংবা পোশাকে লাগার আশংকা থেকে যায় তবে তা নিষেধের আওতাভূক্ত। অন্যথায় গোসলখানা যদি এরূপ তৈরি করা হয় যে, পেশাবের স্থান আলাদা এবং পানি ঢেলে দেওয়ার পর তা বিদূরিত হয়ে স্থান পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বিধান প্রযোজ্য হবে না।

١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ حُجْرٍ - رواه اَبوداؤد والنسائى

১১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ বনজঙ্গলে ও ঘরে সাধারণ হিংস্র প্রাণী গর্ত করে থাকে। সুতরাং যদি কোন আনাড়ী লোক কিংবা অবোধ শিশু গর্তে পেশাব করে, তবে একদিকে উক্ত গর্তে বসবাসকারী প্রাণীকে অযথা কষ্ট দেওয়া হয়, অন্যদিকে গর্তে বসবাসরত সাপ-বিচ্ছু জাতীয় বিষাক্ত প্রাণী বেরিয়ে এসে দংশনও করতে পারে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটে থাকে। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জ্ঞান দানের ক্ষেত্রে তাঁর উম্মাতের জন্য একজন আদর্শ মহান শিক্ষক। তাই তিনি গর্তে পেশাব করে বিপদ আনার ব্যাপারেও সতর্ক করে দিয়েছেন।

পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

١٢- عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ - رواه ابن ماجة وأبو داؤد

১২. হযরত যায়িদ ইব্ন আকরাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পায়খানার স্থানসমূহ হচ্ছে জিন্ শয়তানের উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে এই দু'আ পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে নর ও নারী শয়তান থেকে পানাহ চাচ্ছি।" (আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, আল্লাহ্র যিক্র ও ইবাদাতের সাথে যেমন ফিরিশ্তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অনুরূপভাবে অপবিত্র শয়তানের গভীর সম্পর্ক

রয়েছে অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত স্থানের সাথে এবং তা-ই তার কাছে আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক স্থান। তাই তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উম্মাতের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ কারো যদি প্রয়োজনে পায়খানায় যেতে হয়, তবে তার সেখানকার নর ও নারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়া উচিৎ এবং তার পরে পায়খানায় পা রাখা উচিৎ। কিন্তু সাধারণ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমরা না ইবাদাতের স্থানে ফিরিশ্তাদের উপস্থিতি অনুভব করি না দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে শয়তানের উপস্থিতি উপলব্ধি করি। তাই তো নবী কারীম ﷺ এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাঁর কিছু সংখ্যক বান্দার কখন ও কখনও এরূপ উপলব্ধি হয় এবং তাঁদের ঈমান উৎকর্ষ লাভ করে।

পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসার পর দু'আ

١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ - رواه الترمذى وابن ماجة

১৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ غُفْرَانَكَ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি"। (তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম ﷺ পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর যে মাগফিরাত কামনা করতেন। তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক সূক্ষ্ম, হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা অধমের (গ্রন্থকার) কাছেই এই পারে যে, মানুষের পেটে যে দুর্গন্ধময় পায়খানা জমা হয় তা প্রতিটি মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই যদি তা সময়মত বের করে না দেয়া যায় এবং বারবার পায়খানা করতে হয় তবে তা এক ধরনের রোগ বৈকি! পক্ষান্তরে সাধারণ সুস্থতার দাবি অনুসারে যদি পেট থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যায় তাতে মানুষ মাত্রই শরীরে হাল্কা ও স্বস্তি অনুভব করে। আর এ অভিজ্ঞতা প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। প্রত্যেক সচেতন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের পেটের ময়লার মত গুনাহও বোঝা স্বরূপ। তাই সাধারণ মানুষ পেটের ময়লা দূর করতে যেমন সচেষ্ট, তারা তার চাইতে বেশী সচেষ্ট পিঠ থেকে দুর্ণামের বোঝ দূর করতে।

নবী করীম ﷺ যখন তাঁর পেট থেকে অতিরিক্ত বস্তু বের করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। তখন আল্লাহ্র মহান দরবারে এই বলে দু'আ করতেন– "হে আল্লাহ্! তুমি আমার শরীর থেকে অতিরিক্ত বস্তু বের করে যেমন হাল্কা করেছ এবং শান্তি স্বাচ্ছান্দ্য দান করেছ, তদ্রুপ গুনাহ্ থেকে আমার আত্মাকে পরিচ্ছন্ন কর এবং গুনাহর বোঝা থেকেও আমার পিঠ হাল্কা করে দাও।

নবী করীম ﷺ কে নিম্নবর্ণিত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াত দ্বারা নিষ্পাপ ঘোষণা করা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ

لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ-

"যেন আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন।" (৪৮, সূরা ফাতহ্ :২)

কুরআন মজীদে-এ ঘোষণা থাকার পরও নবী করীম ﷺ কেন ইস্তিগফার পাঠ করতেন। ইনশাআল্লাহ্ সালাত অধ্যায়ের তাহাজ্জুদ অনুচ্ছেদে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

١٤- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الاذى وَعَافَانِىْ - رواه النسائى-

১৪. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ -

"মহান আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক অপবিত্রতা দূর করলেন এবং আমাকে নিরাপদ রাখলেন।"

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে উল্লিখিত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ পায়খানা থেকে বের হয়ে কেবল غفرانك (হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা কর) পাঠ করতেন। পক্ষান্তরে আবূ যার (রা) সূত্রে আলোচ্য হাদীস থেকে দ্বিতীয় দু'আ টি জানা যায়। উভয় দু'আই পরিবেশ ও অবস্থার উপযোগী। সুতরাং বলা চলে, কখনো তিনি পূর্বোক্ত দু'আ আবার কখনো আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত দু'আ পাঠ করতেন।

উযূ ঃ উযূর মাহাত্ম্য ও বরকত

আমি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর বরাতে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সকল মানুষ পাশবিকতার নিগড় উৎরে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করেছেন, পেশার পায়খানা বা অন্য কোন কারণে তাদের উযূ ভঙ্গ হলে তারা তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় ঘোর অন্ধকার ও গ্লানি অনুভব করেন। প্রকৃতপক্ষে এই অনুভূতিরই অপর নাম অপবিত্র অবস্থা। ইসলামী শরী'আত এ অপবিত্র অবস্থা দূরীকরণের লক্ষ্যে উযূর ব্যবস্থা করেছে। যে সকল লোক পাশবিকতার নিগড় থেকে মুক্ত এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে পড়েনি তারা অপবিত্র অবস্থায়

নিজেদের অপবিত্রতার দুর্গন্ধ ও অন্ধকার অনুভব করেন এবং মনে করেন তা থেকে উত্তরণের এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও জ্যোতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেবল উযূই ভূমিকা পালন করতে পারে। এটাই উযূর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। আর এজন্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম সালাত আদায় করার সময় উযূ আবশ্যকীয় করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা উযূর সঙ্গে তার আরও অনেক অনুগ্রহ ও বরকতের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। নবী করীম ﷺ যেমন তাঁর উম্মাতকে উযূর পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানূন শিক্ষা দিয়েছেন। তদ্রুপ ফযীলত ও বরকত সম্পর্কেও বাণী প্রদান করেছেন। কাজেই এ পর্যায়ে কতিপয় হাদীস পাঠ করা যাক।

উযূ পাপ মোচনের মাধ্যম

١٥- عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ- رواه البخارى ومسلم

১৫. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ্ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের ভেতর থেকেও (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রদর্শিত সুন্নাত পদ্ধতি অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে উত্তমরূপে উযূ করে-এতে কেবল তার উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের ময়লা ও অপবিত্রতাই দূরীভূত হয়না বরং এর বরকতে তার সমগ্র দেহ থেকে গুনাহের অপবিত্রতা ও ময়লা বিদূরিত হয়ে যায় এবং উযূকারী কেবল উযূ বিহনী অবস্থা থেকেই নয় বরং গুনাহ্ থেকেও পবিত্র হয়ে যায়।

١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ - رواه مسلم

১৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমান, কিংবা তিনি বলেছেন, মুসলিম বান্দা যখন উযূ করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে, অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার দু চোখের দৃষ্টি পড়েছিল। যখন দু'হাত ধোয় তখন পানির সাথে, অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তাব ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, সেগুলো তার দু'হাত দিয়ে ধরেছিল। যখন সে দু'পা ধোয় তখন পানির সাথে, অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যেগুলোর জন্য তার দু'পা ব্যবহার দ্বারা হয়েছিল। ফলে লোকটি উযূ করার পর সমুদয় গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে কয়েকটি অংশের ব্যাখ্যা- ১. উপরে বর্ণিত হাদীস দু'টিতে উযূর পানির সাথে দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ দূরীভূত হবার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। অথচ দৃশ্যমান ময়লার ন্যায় গুনাহ'র ময়লা এমন বস্তু নয় যা পানির সাথে চলে যাবে এবং ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোন কোন ভাষ্যকার এর ব্যাখ্যায় বলেন, গুনাহ বিদূরিত হবার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্ কর্তৃক পাপমোচন এবং তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। কিছু সংখ্যক ভাষ্যকারের মতে, মানুষ তার যে সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা গুনাহের কাজ করে, প্রথমত তার খারাপ প্রভাব উক্ত অঙ্গসমূহে, তারপর তা অন্তরে বসে যায়। এরপর যখন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আলোকে নিজকে পবিত্র করার লক্ষ্যে নবী করীম ﷺ প্রদর্শিত সুন্নাত পদ্ধতি অনুযায়ী উযূ করে তখন সে যে সকল অঙ্গ দ্বারা গুনাহ্ করেছিল এবং গুনাহের মন্দপ্রভাব যে সব অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অন্তরে যে গুনাহ্ বসে গিয়েছিল উযূর পানির সাথে তা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। এর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার গুনাহ্‌সমূহও ক্ষমা করা হয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অধমের নিকট হাদীসে বর্ণিত শব্দ হচ্ছের অধিক কাছাকাছি।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে মুখমণ্ডল ধোয়ার সাথে কেবল চোখের গুনাহ বিদূরিত হবার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অথচ মুখমণ্ডলে চোখ ব্যতীত নাক, জিহ্বা ও মুখ রয়েছে এবং এসব অঙ্গের সাথেও কোন কোন পাপের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ হাদীসে সামগ্রিকভাবে উযূর অঙ্গসমূহের কথা বলেন নি, বরং উদাহরণ স্বরূপ চোখ, হাত ও পায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়কে আরও বিস্তারিত এক হাদীস ইমাম মালিক এবং নাসাঈ (র) আবদুল্লাহ্ সানাবিহী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উক্ত

হাদীসে কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার সাথে সাথে জিহ্বা, মুখ ও নাকের গুনাহ ধুয়ে মুছে সাফ হওয়ার বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে।

৩. সৎকাজের এমন শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে যে, তা গুনাহের দাগ ও চিহ্ন ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়" (১১, সূরা হূদ ঃ ১১৪)

উল্লিখিত হাদীস সমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ বিশেষ সৎকর্মের নাম ধরে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তা হচ্ছে, অমুক সৎকাজ গুনাহ মিটিয়ে দেয়, অমুক সৎকাজে গুনাহ মাফ হয়ে যায়, অমুক সৎকাজ দ্বারা গুনাহের প্রতিবিধান হয়ে যায়। পূর্বেও এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং সামনেও বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বর্ণিত হবে। কোন কোন হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টরূপে বলেছেন ঃ এসব নেককাজের বরকতে সগীরা গুনাহসমূহে বিমোচিত হয়ে যায়। এ সূত্র ধরে হকপন্থী আলিমগণ বলেন ঃ সৎকাজ দ্বারা কেবলমাত্র সগীরা গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হয়। কুরআন মাজীদেও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ –

"তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব।" (৪, সূরা নিসা ঃ ৩১)

মোদ্দাকথা, উল্লিখিত দু'টি হাদীসে উযূর বরকতে যে সকল গুনাহ বিধৌত ও বিদূরিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে তার দ্বারা সগীরা গুনাহসমূহে বুঝানো হয়েছে। কবীরা গুনাহর বিষয়টি খুবই গুরুতর এ থকে উত্তরণের পথ একটাই, আর তা হচ্ছে তাওবা।

উযূ জান্নাতের সকল দরজা উম্মোচনের চাবি

١٧– عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّاءُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُهَا مِنْ اَيِّهَا شَاءَ –– رواه مسلم

১৭. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উযূ করবে এবং পূর্ণভাবে উযূ করবে অতঃপর

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ –

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ কোন এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল"– পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এরপর সে উক্ত দরজাসমূহের যে কোনটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উযূ করায় সাধারণত বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচ্ছন্ন হয়। তাই মু'মিন ব্যক্তি যখন উযূ করে তখন সে মূলতঃ আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে এবং বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করে। কিন্তু প্রকৃত আবর্জনা ও মালিন্য হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা, নিষ্ঠার ঘাটতি এবং মন্দ কাজের জঞ্জাল। এ অনুভূতিকে সামনে রেখে ঈমানকে নূতন করার লক্ষ্যে, আল্লাহ্র ইবাদতে নিষ্ঠার পরিচয় দিতে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ অনুসরণ করতে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে যেন নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এর ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাঠকের জন্য মাগফিরাতের পূর্ণ ফয়সালা হয়ে যায়। তাই হাদীসে বলা হয়েছে যে, তার জন্য জান্নাতের সকল দরজা উন্মুক্ত।

ইমাম মুসলিম (র) অন্যত্র কালেমা শাহাদাতের নিম্নোক্ত শব্দগুচ্ছও বর্ণনা করেছেন–

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ –

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।"

ইমাম তিরমিযী (র) এ হাদীস বর্ণনায় নিম্নোক্ত শব্দগুচ্ছ ও উল্লেখ করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ –

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল কর।"

কিয়ামতের দিন উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে জ্যোতি চমকাবে

١٨– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ –رواه البخارى ومسلم

১৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে আহবান করা হবে, উযূর চিহ্নের দরূন। তাদের চেহারা, হাত ও পা হতে জ্যোতি চমকাবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঔজ্জ্বল্যকে বাড়াতে চায়, সে যেন তাই করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ায় উযূর প্রভাব কেবল এতটুকু পরিদৃষ্ট হয় যে, চেহারা ও হাত-পা পরিষ্কার হয়ে যায়। অধিকন্তু আধ্যাত্মিক মনন সম্পন্ন নিষ্ঠাবান লোকেরা আত্মিক সজীবতা ও আনন্দ অনুভব করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এবং অন্যান্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, উযূর বরকতে কিয়ামতের দিন উযূকারীর চেহারায় প্রোজ্জল আভা ও দীপ্তি শোভা পাবে এবং অন্যান্যদের মধ্য থেকে বেছে নেয়ার চিহ্নও হবে। যার উযূ যত উত্তম ও পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবে তার জ্যোতি ও ততবেশী দীপ্তিময় হবে। তাই তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের শেষাংশে বলেছেন ঃ যে পারে সে যেন তার জ্যোতি বৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করে। এর পদ্ধতি হচ্ছে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে উযূর নিয়ম-কানূনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে উযূ করা।

কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা

١٩– عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطِ – رواه مسلم

১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলব না যাতে করে আল্লাহ্ তোমাদের পাপরাশি মিটিয়ে দেবেন এবং মর্যাদা সমুন্নত করবেন? সাহাবা কিরাম আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন ঃ তা হল অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে উযূ করা, মসজিদে আসার জন্য অধিক পদচারণা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রেখ, এটাই হচ্ছে রিবাত- প্রকৃত সীমান্ত প্রহরা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন এবং বলেছেন ঃ এসকল কাজ করায় পাচমোচন হয় এবং উত্তরোত্তর মর্যাদা বেড়ে যায়। কাজগুলো হলো ঃ

১. উযূ করার সময় যদি কষ্টও হয় তবুও পূর্ণরূপে উযূ করা এবং সুন্নাত পরিপন্থী সংক্ষিপ্ত উযূ না করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি শীতকাল হয়, পানি ভীষণ ঠাণ্ডা হয়, বা পানি এত কম হয় যাতে সুন্নাত মুতাবিক প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করা না যায় ইত্যাদি অবস্থায় যদি পর্যাপ্ত পানির জন্য দূরে যেতে হয় এবং কষ্ট স্বীকার করে সুন্নাত মুতাবিক পুরোপুরি উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করা হয়, তবে তা হবে এমনই পসন্দনীয় কাজ যে, এর বরকতে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং মর্যাদা সমুন্নত করে দিবেন।

২. দ্বিতীয় কাজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ 'মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা।' অর্থাৎ মসজিদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখা। সালাত আদায়ের জন্য বার বার মসজিদে যাওয়া এবং যার ঘর মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত তার অধিক সাওয়াব লাভ করে ধন্য হওয়া।

৩. তৃতীয় কাজ সম্পর্কে বলেছেন ঃ এক সালাত আদায়ের পর অন্য সালাতের প্রতীক্ষায় থাকা এবং এর দিকে অন্তর নিবদ্ধ রাখা। বলাবাহুল্য, সালাত আদায়ের যার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে কেবল তারই এহেন অবস্থা হয়ে থাকে এবং তারই ভাগ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ

"হে আল্লাহ্! সালাত দ্বারা আমার চোখ জুড়িয়ে দাও"– এর অনুভূতির কিছুটা নসীব হয়।

হাদীসের শেষাংশে তিনি বলেছেন ঃ এই হচ্ছে প্রকৃত 'রিবাত'। রিবাতের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় প্রহরারত থাকা। প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সীমান্তে যে যোদ্ধাদের মোতায়েন করা হয় এবং তারা যে প্রহরারত থাকে তারই নাম 'রিবাত'। একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এ হচ্ছে একটি বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন কাজ। কারণ সর্বদা জীবনের ঝুঁকি থাকে। হাদীসে বর্ণিত উল্লিখিত তিনটি কাজকে সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য বিরাত বলেছেন যে, এসকল কাজের মাধ্যমে শয়তানের ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং শয়তানের হামলা থেকে ঈমান রক্ষা করা হয়। বলা বাহুল্য, এদিক বিবেচনায় রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার চেয়ে ঈমান রক্ষার বিষয়টি আরো অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে।

পূর্ণ গুরুত্বের সাথে উযূ করা ঈমানের লক্ষণ

٢٠– عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلاَّ مُؤْمِنٌ – رواه مالك وأحمد وابن ماجة والدارمى

২০. হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সঠিক পথে অবিচল থাকো। তবে কখনো তোমরা পূর্ণ অবিচল থাকতে পারবে না (তাই নিজেদের ত্রুটির কথা স্মরণ রাখবে)। জেনে রেখ, তোমাদের কাজ সমূহের মধ্যে সালাত হচ্ছে সর্বোত্তম এবং মু'মিন ব্যতীত কেউই যথোচিত পদ্ধতিতে উযূ করে না। (মালিক, আহ্‌মাদ. ইব্‌ন মাজাহ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ উযূর প্রতি যত্নবান সতর্ক থাকার অর্থ এও হতে পারে, সর্বদা সুন্নাত পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তমরূপে উযূ করা। আবার এও হতে পারে, সব সময় উযূ অবস্থায় থাকা। ভাষ্যকারগণ উভয় ব্যাখ্যাকে অনুমোদন করেছেন। অধমের (গ্রন্থকার) নিকট উভয় ব্যাখ্যাই যথার্থ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই হাদীসে "উযূর প্রতি যত্নবান থাকা" কে পূর্ণ ঈমানের এবং অবিচল বিশ্বাসের প্রতিফলন বলে বর্ণনা করেছেন।

উযূ থাকা অবস্থায় পুনঃ উযূ করা

٢١- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ - رواه الترمذى

২১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ থাকা অবস্থায় পুনঃ উযূ করবে তাকে দশটি নেকী দান করা হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে , উযূ থাকা অবস্থায় পুনঃ উযূ করাকে কেউ যেন নিরর্থক মনে না করে। বরং একাজ এমন উত্তম যে, এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীস ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে প্রথম উযূ দ্বারা এমন ইবাদাত করল যার জন্য উযূ প্রয়োজন। আর যদি কেউ অযূ করল এবং এ অযূ দ্বারা কোন ইবাদত করল না কিংবা এমন কাজ না করে যার জন্য নূতন উযূ করা মুস্তাহাব হয়, এমতাবস্থায় তার পক্ষে নূতন করে উযূ করার আদৌ প্রয়োজন নেই।

অসম্পূর্ণ উযূর অশুভ প্রভাব

٢٢- عَنْ شُبَيْبِ بْنِ اَبِىْ رَوْحٍ عَنْ رَّجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ

مَابَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ وَاِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُوْلٰئِكَ -رواه النسائى

২২. শুবায়ব ইব্‌ন আবূ রাওহ্ (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জনৈক সাহাবা থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি তাতে সূরা রূম পাঠ করেন। কিন্তু কিরা'আতে বিভ্রাট হয়ে যায়। সালাত আদায় শেষে তিনি মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ লোকদের কী হলো তারা আমাদের সাথে সালাত আদায় করছে অথচ উত্তমরূপে উযূ করেনি। ঐসকল লোকই আমাদের কিরা'আতে বিভ্রাট সৃষ্টি করে । (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, উযূবিহীন অবস্থা কিংবা উত্তমরূপে উযূ না করার প্রতিক্রিয়া অপরাপর উযূকারীদের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে কিরা'আতে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। রাসূলূল্লাহ্ ﷺ -এর উপর অপূর্ণ উযূর প্রভাব এত কার্যকর হয় তবে আমাদের ন্যায়সাধারণ লোকদের উপর তার অশুভ প্রভাব কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আমাদের অন্তরে মরিচার স্তর জমাট হয়ে যাওয়ায় এর অশুভ প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুভূত হয় না। এ হাদীস থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, মানুষের অন্তরের উপর পাশের লোকের ভালমন্দ অবস্থার প্রভাব পড়ে। সূফী আউলিয়াগণ এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান রাখেন।

মিস্‌ওয়াকের গুরুত্ব ও ফযীলত

পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সব বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন তন্মধ্যে মিস্‌ওয়াক অন্যতম। এক হাদীসে ত তিনি এমনও বলেছেন ঃ সকল সালাতের পূর্বে মিস্‌ওয়াক করা যদি আমি আমার উম্মাতের উপর কষ্টকর মনে না কারতাম, তাহলে প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মিস্‌ওয়াক করা অপরিহার্য ঘোষণা করতাম। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মিস্‌ওয়াক করায় যে অনেক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা বর্তমানে অল্প-বিস্তার সকলেই জানেন। কিন্তু ধর্মীয় দিক থেকে এর প্রকৃত গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, মিস্‌ওয়াক আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার সর্বাধিক কার্যকর মাধ্যম । এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর মিস্‌ওয়াকের প্রতি অনুপ্রেরণা ও গুরুত্বরোপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কতিপয় হাদীস পাঠ করে নেয়া যেতে পারে।

٢٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ - رواه الشافعى أحمد والدارمى والنسائى وروى البخارى فى صحيحة بلا إسناد-

২৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মিস্ওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। (শাফিঈ, আহ্মাদ, দারিমী, নাসায়ী; বুখারী সনদহীন সূত্রে)

ব্যাখ্যা ঃ কোন বস্তুর সৌন্দর্যের দু'টি দিক হতে পারে। একটি হল, দুনিয়াতে উপকারী এবং সাধারণ মানুষের কাছে পসন্দনীয় হওয়া এবং অপরটি হল, আল্লাহ্র কাছে প্রিয় সাব্যস্ত হওয়া এবং আখিরাতে সাওয়াব প্রাপ্তির মাধ্যম হওয়া। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ হাদীসে উভয়বিধ উপকারিতার প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। কারণ মিস্ওয়াক করায় মুখ পরিষ্কার হয়, দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়ে ক্ষতিকর বস্তু বেরিয়ে যায়– এ হ'ল দুনিয়ায় নগদ উপকারিতা। আর দ্বিতীয় উপকারিতা হল আখিরাতে, যা স্থায়ী ও অধিক উপকারী। তা হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন যা মুক্তির বিশেষ মাধ্যম বিবেচিত হতে পারে।

٢٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ – رواه البخارى ومسلم واللفظ المسلم

২৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে নবী কারীম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি যদি আমার উম্মাতকে কষ্টে নিক্ষেপ করব মনে না করতাম, তাহলে তাদের উপর প্রত্যেক সালাতের সময় মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা মুসলিমের)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র কাছে মিস্ওয়াক প্রিয় হওয়া ও এর বহুবিধ উপকারিতা লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মন চাচ্ছে যেন উম্মাতের জন্য সালাতের পূর্বে মিস্ওয়াক করা অপরিহার্য করে দেন। কিন্তু এ নির্দেশ একথা মনে করে দেন নি যে, এ নির্দেশ উম্মাতের উপর ভারী বোঝা মনে হতে পারে এবং সবার তা মান্য করা কষ্টসাধ্য হতে পারে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ হচ্ছে অনুপ্রেরণা ও গুরুত্বারোপ করার একটি পদ্ধতি এবং নিঃসন্দেহে প্রভাবময়ী পদ্ধতি।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসের কোন কোন সূত্রে "عند كل صلوة" (প্রত্যেক সালাতের সময়) এর স্থলে "عند كل وضوء" (প্রত্যেক উযূর সময়) এর উল্লেখ রয়েছে[১] তবে উভয় বর্ণনার মর্ম প্রায় কাছাকাছি।

১. এ পর্যায়ে বুখারী শরীফের সিয়াম অধ্যায় এর "বাবুস সিওয়াকির রুতাবি ওয়াল-ইয়াবিসি লিস্ সায়িম" অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

٢٥– عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاجَاءَ فِىْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطُّ اِلاَّ اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِىَّ –رواه احمد

২৫. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জিব্রাঈল যখনই আমার নিকট আসতেন তখনই আমাকে মিস্ওয়াক করতে বলতেন। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি আমার মুখের সম্মুখভাগ (মাড়ি) না ক্ষয় করে ফেলি (আহ্মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত জিব্রাঈল (আ) কর্তৃক বারবার মিস্ওয়াক করার প্রতি গুরুত্বারোপ মূলতঃ আল্লাহ্রই নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত। এর বিশেষ রহস্য এও হতে পারে যে, যিনি সময় সময় মহান আল্লাহ্ কর্তৃক সম্বোধিত হন এবং আল্লাহ্র এ মহান ফিরিশ্তা যাঁর কাছে বারবার আসেন এবং আল্লাহ্র বাণী পাঠ করে শুনান ও একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিক-নির্দেশনা দেন তাঁর মিস্ওয়াকের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকা উচিত। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতবেশী গুরুত্ব সহকারে মিস্ওয়াক করতেন।

মিস্ওয়াক করার বিশেষ সময় ও স্থান

٢٦– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلاَّ يَتَسَوَّكَ قَبْلَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ – رواه أبوداؤد

২৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ রাতে বা দিনে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে উযূ করার পূর্বেই মিস্ওয়াক করে নিতেন। (আহ্মাদ ও আবূ দাউদ)

٢٧– عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ التَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ – رواه البخارى ومسلم

২৭. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠলে প্রথমেই মিস্ওয়াক দ্বারা নিজ মুখ পরিষ্কার করে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨– عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىْ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ – رواه مسلم

২৮. হযরত শুরাইহ্ ইব্ন হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একবার আয়েশা (রা) এর কাছে জানতে চাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কী কাজ করেন? তিনি বললেন ঃ মিস্ওয়াক করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এসব হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক নিদ্রা বিশেষত রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের জন্য উঠলে ভালোভাবে মিস্ওয়াক করে নিতেন। এতদ্ব্যতীত কোন সফর থেকে ঘরে প্রবেশের পর তার প্রথম কাজ হতো মিস্ওয়াক করা। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, কেবল উযূর সাথে মিস্ওয়াকের সম্পর্ক নয়। ঘুম থেকে ওঠার পর এবং মিস্ওয়াক করার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে, উযূ করা হোক কি নাই হোক, মিস্ওয়াক করা চাই। এসব হাদীসের আলোকে আমাদের পূর্ববর্তী প্রাজ্ঞ আলিমগণ লেখেন, মিস্ওয়াক করাত সব সময়ের জন্যই মুস্তাহাব এবং সাওয়াব প্রাপ্তির মাধ্যম। তবে বিশেষ পাঁচ সময়ে মিস্ওয়াক করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যথাঃ ১. উযূর পূর্বে, ২. উযূ এবং সালাতের মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে সালাতে দাঁড়ানোর সময়, ৩. কুরআন শরীফ পাঠের পূর্বে ৪. নিদ্রা ভঙ্গ করার পর এবং ৫. মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হলে এবং দাঁত ময়লা হয়ে গেলে দাঁত পরিষ্কার করার লক্ষ্যে মিস্ওয়াক করা।

মিস্ওয়াক করা আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত ও প্রকৃতির দাবি

٢٩- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ - رواه الترمذى

২৯. হযরত আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চারটি কাজ আম্বিয়া কিরামের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। যথাঃ- ১.লজ্জাশীলতা, ২. সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৩. মিস্ওয়াক করা এবং ৪. বিয়ে করা। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ হাদীসে বলেন ঃ চারটি কাজ আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত ও সহজাত কাজের অন্তর্ভূক্ত। তাই তিনি নিজে উম্মাতকে এ বিষয়ে প্রভাবময়ী ও কার্যকর অনুপ্রেরণা দান করেছেন। ১. লজ্জাশীলতা- এ বিষয়ে আমি কিতাবুল আখ্লাকে সবিস্তার আলোচনা করেছি ২. বিয়ে-শাদী- ইনশাআল্লাহ্ কিতাবুন নিকাহে বিস্তারিত আলোচনা করব, ৩. সুগন্ধি– সুগন্ধি মাত্রই মানুষের কাছে প্রিয় এবং মানুষের আধ্যাত্মিক এবং ফিরিশ্তাসুলভ স্বভাবের অনিবার্য দাবি। এর দ্বারা আত্মা ও অন্তর বিশেষ সজীবতা লাভ করে, ইবাদতে প্রেরণা

যোগায় এবং আল্লাহ্র অপরাপর বান্দাদেরকেও প্রশান্তি দান করে। এজন্যে সকল আম্বিয়া কিরাম এবং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের কাছে এসব কাজ এত বেশী প্রিয়, সুন্নাত।

٣٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الاَظْفَارِ وَغَسْلُ التَّرَاجِمِ وَتَنْفُ الابِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمُضْمَضَةُ - رواه مسلم

৩০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। তা হল গোফ ছাঁটো দাড়ি লম্বা করা, মিস্ওয়াক করা, নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, নাক-কানের ছিদ্র এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশমকাটা এবং পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা। হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ দশমটি আমি ভুলে গেছি। তবে সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে বর্ণিত দশটি বস্তুকে 'ফিতরাতের' অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফিত্রাত (الفطرة) দ্বারা নবী-রাসূলের তরীকা-পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। একথার সমর্থন ইব্ন আওয়ানা (রা) বর্ণিত হাদীসে فطرة এর স্থলে سنة শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তার বর্ণনায় "عشر من الفطرة" এর স্থলে "عشر من السنة" রয়েছে। এ হাদীসে ঐ সকল ভাষ্যকারদের মতে, 'ফিতরাত' অর্থ হচ্ছে, নবী-রাসূলদের অনুমোদিত কাজ। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই-নবী-রাসূলগণ তাঁদের পুণ্যময় জীবন যার উপর অতিবাহিত করেন এবং উম্মাতকে চলার নির্দেশ দেন এদশটি বস্তু তারই অন্তর্ভুক্ত। এ দশটি বিষয়ই সকল নবী-রাসূলের সার্বজনীন শিক্ষা ও সম্মিলিত আমল।

কোন কোন ভাষ্যকার 'ফিতরাত' দ্বারা ইসলাম ধর্মকে বুঝিয়েছেন। কারণ কুরআন মাজীদে দীনকে 'ফিতরাত' বলা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন" (৩০, সূরা রূম ঃ ৩০)

উক্ত আয়াতের অর্থের ভিত্তিতে হাদীসের মূলকথা হবে-এ দশটি বস্তু ইসলাম ধর্মের অঙ্গীভূত।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার 'ফিতরাত' দ্বারা মানুষের মৌলিক প্রকৃতি বুঝিয়েছেন। এ ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য হবে এরূপ– এ দশটি বস্তু মানব স্বভাবের দাবি যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সহজাত প্রকৃতির দাবি হচ্ছে, ঈমান আনা, পবিত্র জীবন পসন্দ করা এবং কুফ্‌র অশ্লীলতা ও মন্দকাজ, অপবিত্রতা অশুচিতা অপসন্দ করা। তাই উল্লিখিত দশটি বস্তু হচ্ছে মানুষের সহজাত পসন্দের বিষয়। আর একথা সর্বজনমান্য যে, নবী-রাসূলগণ যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাই হবে মানুষের প্রকৃতির দাবি, এটাই তো স্বাভাবিক।

এ ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, 'ফিতরাত' এর দ্বারা নবী-রাসূলগণের সুন্নাত এবং ইসলাম ধর্ম অথবা মানব প্রকৃতির মৌল দাবি বুঝানো হয়েছে। তবে হাদীসের তিনটি ব্যাখ্যায় অর্থ একই থাকে। যে দশটি বস্তু নিয়ে নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন তা যেমন শরী'আতের অপরিহার্য অঙ্গ, তদ্রুপ মানব প্রকৃতিরও অনিবার্য দাবি। হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তার সারমর্ম নিম্নে পেশ করা হল ঃ

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত দশটি বস্তু মূলতঃ তাহারাত অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং মিল্লাতে হানীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) থেকে বর্ণিত। ইব্‌রাহীমী তরীকার উপর অবিচল থাকতে প্রস্তুত উম্মাতের মধ্যে এসবের সাধারণ প্রচলন রয়েছে এবং এর উপর রয়েছে তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা। শতাব্দীর পর শতাব্দী উপরোক্ত আমলসমূহ কার্যকারী রয়েছে এবং এরই উপর মানুষ জীবিত থাকছে এবং ইন্তিকাল করছে। আর এজন্যেই এগুলোকে 'ফিতরাত' এবং মিল্লাতে হানীফের অন্যতম লক্ষণও বলা হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু লক্ষণ ও প্রতীক থাকা প্রয়োজন, যাতে তার অনুসারীদের সহজেই চেনা যায় এবং এবিষয়ে সংকোচ প্রদর্শনকারীদের পাকড়াও করে শাস্তি বিধান করা যায় এবং ধর্মের অনুসারী ও ধর্মবিমুখ উভয়বিধ লোকদের চিহ্নিত করা যায়। লক্ষণ এমন হওয়া চাই যা কদাচিত নয় বরং অহরহ ঘটে এবং যাতে বহুবিধ উপকারিতা নিহিত

থাকে। মানুষের মননশীলতা তা মেনে নেয়। এদশটি বস্তুতেই এ গুণগুলো পাওয়া যায়। এগুলো অনুধাবন করার জন্য নিম্নের কথাগুলো গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিৎ।

মানবদেহের কোন স্থানের চুল বেড়ে গেলে রুচিসম্পন্ন মানুষের মনে তা মালিন্যের ভাব সৃষ্টি হয়, যেমন শরীর থেকে কোন দুর্গন্ধময় বস্তু বের হয়ে মালিন্যের ভাব হয়ে থাকে। বগলের এবং গাভীর নিচের চুল এ সবের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এগুলো পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে রুচীবান মানুষ মাত্র প্রফুল্লতা ও সজীবতা উপলব্দি করে আর এরূপ অনুভব করাই হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অনিবার্য দাবি এবং নখের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। দাড়ি কখনো ছোট বড় হয়ে থাকে এবং তা পুরুষের সৌন্দর্যবর্ধন করে এবং এভাবেই তা পুরুষত্বের প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়। দাড়ি নবী-রাসূলগণের সুন্নাত। কাজেই দাড়ি রাখা পুরুষের কর্তব্য[১] এবং তা মুণ্ডন করা অগ্নিপূজক, হিন্দু অপরাপর অমুসলিম জাতির প্রতীক। সাধারণত নিম্নবর্ণের লোকেরাই দাড়ি মুণ্ডন করে থাকে। সুতরাং দাড়ি না রাখা মূলতঃ নিজকে নিচ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ারই নামান্তর।

গোঁপ বড় রাখার ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, গোঁপ বেড়ে গেলে পানাহারের বস্তু গোঁফে লেগে যেতে পারে এবং নাকের ময়লা যেহেতু গোঁফের সোজাসুজি পথে বের হয় তাই তা পরিষ্কার রাখার অনিবার্য দাবি হিসেবে গোঁফ বড় না করা উচিত। আর এজন্যই গোঁপ ছোট রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। কুলি এবং পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা হয় মিস্‌ওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার রাখা হয়, পানি দ্বারা ইস্‌তিনজা করা হয় এবং উযূতে পানি দ্বারা আঙ্গুলের ময়লা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। সুতরাং উপরিউক্ত দশটি কাজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিধানের ক্ষেত্রে যে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোন কোন প্রাজ্ঞ আলিম এ হাদীসের আলোকে এ মূলনীতি পেশ করেছেন যে, শরীর পরিষ্কারকরণ, চেহারার শোভা বর্ধন এবং বিরক্তিকর যাবতীয় বস্তু দূরীকরণ এবং যে সব কারণে মানুষের রুচি বিগড়ে যায় তা বর্জন মূলতঃ নবী-রাসূলগণেরই সুন্নাত। চেহারার সৌন্দর্য বধর্নকে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যতম নি'আমত ও দান বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

১. টিকা ঃ- অপরাপর হাদীসে দাড়ি রাখার নির্দেশ মূলতঃ নির্দেশসূচক শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যার ফলে আলিমগণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব মনে করেন। হাদীসে দাড়ির পরিমাণ সম্পর্কীয় পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ফিক্‌হবিদগণ বিভিন্ন নিদর্শনের বরাত দিয়ে এক মুষ্টি দাড়ি রাখা ওয়াজিব বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

"তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন-তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন।" (৬৪ সূরা তাগাবুন ঃ ৩)

এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে তাঁর ভাগ্নে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে তাল্ক ইব্ন হাবীব এবং তাঁর থেকে মুস'আব ইব্ন শায়বা এবং তাঁর থেকে তাঁর ছাত্র যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়িদা বর্ণনা করেছেন। এই যাকারিয়া স্বীয় উস্তাদ মুস্'আব থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে দশটি বস্তুর মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং দশ নম্বরটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ আমার সঠিক স্মরণ নেই। তবে আমার মনে হয় সেটি হল 'কুলি করা'।

সালাতের গুরুত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মিস্ওয়াকের প্রভাব

٣١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا - رواه البهيقى فى شعب الايمان-

৩১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সালাতের জন্য মিস্ওয়াক করা হয় তার মর্যাদা মিস্ওয়াকহীন সালাতের চেয়ে সত্তরগুণ বেশী। (বায়হাকীর শু'আবুল ইমান)

ব্যাখ্যা ঃ একথা বহুবার বলা হয়েছে যে, আরবী ভাষায় সত্তর এর ব্যবহার দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হয় না। বরং আধিক্য বুঝানো হয় সম্ভবত আলোচ্য হাদীসেও সত্তর সংখ্যাটি আধিক্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসের মর্ম হবে এই যে, যে সালাতের জন্য মিস্ওয়াক করা হয় তার মর্যাদা মিস্ওয়াকবিহীন সালাতের চেয়ে অনেক বেশি। আর 'সাবয়ীন' দ্বারা যদি সত্তর-ই উদ্দেশ্য হয় তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

যখন কোন লোক আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ্র দরবারে সালাত সমাপনান্তে দু'আও মুনাজাতের ইচ্ছা করে তখন তার অন্তরের গভীর প্রকোষ্ঠে এ চেতনা জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক যে, মিশ্ক ও গোলাপ মেখে জিহ্বা ও মননকে পরিচ্ছন্ন করে দু'আ করে। কিন্তু আল্লাহ্ কেবল মিস্ওয়াক করাকেই যথেষ্ট সাব্যস্ত করেছেন এবং তারই নির্দেশ দিয়েছেন। মোটকথা, কোন লোক যদি এ চেতনার আলোকে সালাতের জন্য মিস্ওয়াক করে, তবে মিস্ওয়াক বিহীন সালাতের চেয়ে সত্তর কিংবা ততোধিক গুণ সাওয়াব বেশী হওয়াই স্বাভাবিক, তবে বস্তুতঃপক্ষে-

هزار بار بشويم دهن زمشك وگلاب

بنوز نام تو گفتن كمال بے ادبى است

"মিশ্ক ও গোলাপ দিয়ে মুখ ধুয়ে নেই হাযার বার

তব নাম মুখে নেওয়া তবুও ত হায় বে-আদাবী সার।"

জ্ঞাতব্যঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে মিশকাত শরীফে কেবল ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় আলোচ্য হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লামা মুনযিরী (র) তাঁর "আত্ তারগীর ওয়াত তারহীব" গ্রন্থে আয়েশা (রা) শাব্দিক পরিবর্তনসহ হাদীসসমূহ প্রসঙ্গে বলেন "আহ্মদ, বায্যাব, আবূ ই'আলা ও ইব্ন খুযায়মা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদ্রাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকীম বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। প্রায় কাছাকাছি অর্থের একই বিষয়ের আরেকটি হাদীস আবূ নু'আয়ম (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এবং অন্য সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। প্রথম সনদটি উত্তম এবং দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ।

সালাতের জন্য উযূর নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহারাত সম্পর্কে স্বীয় উম্মাতকে যেদিক নির্দেশনা দিয়েছেন তার মধ্যে এমনও কতিপয় বিষয় রয়েছে যা নির্দিষ্ট আহ্কামের মর্যাদা রাখে। যেমন, ইস্তিনজার আহ্কাম দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখার আহ্কাম, পানি পবিত্র কিংবা অপবিত্র হওয়ার বিস্তারিত আহ্কাম ইত্যাদি কতিপয় বিষয় এমনও রয়েছে যা সালাতের শর্তের মর্যাদা রাখে। সালাতের জন্য উযূর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ -

"যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ্ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।" (৫, সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সালাত যেহেতু মহান আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিতি, সম্বোধন ও মুনাজাতের একটি বিশেষ পদ্ধতি তাই এর শর্ত হচ্ছে উযূ অবস্থায় সম্পাদন করা। পক্ষান্তরে কেউ উযূবিহীন হলে এবং সালাত আদায়ের ইচ্ছা করলে সে যেন সালাত শুরুর পূর্বেই উযূ করে নেয়। কারণ মহান আল্লাহ্র

দরবারে এ বিশেষ উপস্থিতির জন্য উযূর বিকল্প নেই। উযূবিহীন সালাত কোন অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতিপয় হাদীস পাঠ করা যাক।

٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلٰوةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَأَ - رواه البخارى

৩২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পবিত্রতা ব্যতীত কারো সালাত কবূল হয় না, যতক্ষণে সে উযূ না করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلٰوةُ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةَ مِنْ غُلُوْلٍ - رواه مسلم

৩৩. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবূল হয়না এবং হারাম উপায়ে অর্জিত মালের সাদাকাও কবূল হয়না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে طهور (তুহূর) দ্বারা উযূ বুঝানো হয়েছে। এ হাদীস ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের মর্ম একই, উপরের বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল শব্দগত।

٣٤- عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ - رواه أبوداؤد والترمذى والدارمى ورواه ابن ماجة عنه وعن أبى سعيد

৩৪. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তাহারাত হল সালাতের চাবি। তাক্বীর হল তার (সালাতের মধ্যে কথাবার্তা, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি যাবতীয় হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম হল তার (সালাতের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ) হালালকারী। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারিমী এবং ইব্ন মাজাহ্ আলী (রা) ছাড়াও আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে)

٣٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ - رواه أحمد

৩৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের চাবি হল সালাত আর সালাতের চাবি হল উযূ। (আহমাদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই দুই হাদীস তাহারাত অর্থাৎ উযূকে সালাতের দাবি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ যেন তালার চাবি সদৃশ যা খোলা ব্যতীত ভেতরে, প্রবেশ করা যায় না। অনুরূপভাবে উযূ ছাড়া সালাত শুরু করা যায় না। উপরে বর্ণিত চারটি হাদীসে খানিকটা শাব্দিক আমল পরিলক্ষিত হলেও মূলতঃ সব কয়টির মর্ম প্রায় একই। প্রত্যেক হাদীসেই একথা বলা হয়েছে যে, সালাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে উযূ অপরিহার্য শর্ত। সালাত আল্লাহ্র মহান দরবারের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ, সম্বোধন ও মুনাজাত করার শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত পদ্ধতি। এ দুনিয়ায় এর চাইতে উত্তম কিছু পাওয়া যেতে পারে না। এ হক আদায়ের শ্রেষ্ঠতম পন্থা ছিল, প্রত্যেক সালাত শুরুর পূর্বে দেহ পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে গোসল করার এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছেদ পরার বিশেষ নির্দেশ দান। কিন্তু এ কাজ যেহেতু সর্বদা আঞ্জাম দেওয়া কষ্টকর তাই আল্লাহ্ তা'আলা সালাতের জন্য কেবল পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় এবং গোসল করার পরিবর্তে উযূ করাকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারণ উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহের গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। এ বিবেচনায় উযূ করাকে সারা দেহ পরিচ্ছিন্ন করার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। হাত, পা, চেহারাও অন্যান্য যে সব অঙ্গ সাধারণত পোশাকের বাইরে থাকে তার কোনটি ধৌত করার এবং কোনটি মাসেহ্ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য কথায় উযূবিহীন অবস্থায় যেন মানব স্বভাবে আত্মিক অপবিত্রতা অনুভূত হয় এবং উযূ করার ফলে মানবআত্মা এক বিশেষ পবিত্র অবস্থা ও অন্তরে, জ্যোতি অনুভব করে। এ অনুভূতি আল্লাহ্র যে সকল বান্দার রয়েছে তাঁরা ভাল করেই জানে, সালাতের জন্য উযূ অপরিহার্য শর্ত স্থির করার মূলে কী রহস্য নিহিত। আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ কমপক্ষে এতটুকু অনুভব করে যে, আল্লাহ্র মহান দরবারে উপস্থিতি পেশ করার ক্ষেত্রে এতটুকু শিষ্টাচার রক্ষা করা উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিতির লক্ষ্যে উযূ করবে সেও তার অন্তরে উযূর এক বিশেষ স্বাদ ও জ্যোতি অনুভব করবে।

উযূর নিয়ম

٣٦- عَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى اِلَى الْمَرَافِقِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلٰثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ

اللّٰه ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَىْءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ – رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى

৩৬. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার এরূপ উযূ করেন, "তিনবার তাঁর দুই হাতের উপর পানি ঢালেন এরপর কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন ও বের করে দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন। তারপর সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন। প্রথমে তিনবার ডানহাত এবং পরে তিনবার বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর মাথা মসেহ্ করেন। এরপর তিনবার ডান পা এবং পরে তিনবার বাম পা ধৌত করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি যেরূপ উযূ করলাম এরূপ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে উযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ উযূ করে ভিন্ন চিন্তাবাদ বাদ দিয়ে পূর্ণ মনোযোগসহ দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে তার পূর্বেকৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা বুখারীর)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উসমান (রা) আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূর যে নিয়ম কার্যত দেখালেন তাই মূলতঃ উযূর উত্তম সুন্নাত নিয়ম। নবী করীম ﷺ কয়বার কুলি দ্বারা মুখ এবং পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করেছিলেন, এ হাদীসে তার উল্লেখ নেই। কিন্তু অপরাপর বর্ণনা দ্বারা তিনবারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

এ হাদীসে একাগ্রতা ও বিণয় নম্রতার সাথে যে দু'রাক'আত সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে তা নফল সালাত নাও হতে পারে। কাজেই বলা যায়, কেউ যদি মাসনূন পদ্ধতিতে উযূ করে ফরয কিংবা সুন্নাত সালাত আদায় করে এবং তাতে পূর্ণ একাগ্রতা থাকে সেও আল্লাহ্ চাহেত প্রতিশ্রুত মাগফিরাত লাভে ধন্য হবে।

হাদীস ভাষ্যকার ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের মতে, মনে যদি এদিক সেদিকের খেয়াল চেপে বসে তবে তাই হচ্ছে বিক্ষিপ্ত চিন্তা। কিন্তু যদি কোন খেয়াল অন্তরে বদ্ধমূল না হয় এবং তা দূরীকরণের চেষ্টা করা হয় তবে কোন ক্ষতি নেই। কারণ এসব বিষয় কামিল মু'মিনদের সামনেও ভেসে ওঠে।

٣٧- عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلْثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا وَمَسَحَ

بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طُهُوْرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ – رواه الترمذى والنسائى

৩৭. আবূ হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হযরত আলী (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন এবং ভাল করে পরিষ্কার করলেন, তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন, তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুইলেন, একবার মাথা মাসেহ্ করলেন, এবং উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং উযূর অবশিষ্ট পানি তুলে নিয়ে তা দাঁড়ান অবস্থায় পান করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উযূ কিরূপ ছিল তা তোমাদের দেখানোর জন্যই আমি এরূপ করা পসন্দ করলাম। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উসমান ও আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করতেন এবং একবার মাথা মাসেহ্ করতেন, কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে, তিনি উযূর অঙ্গসমূহ একবার করে আবার কখনো দু'বার করে ধৌত করা যথেষ্ট মনে করেছেন। তবে তাঁর এধরনের কাজের উদ্দেশ্য ছিল লোকদের জানিয়ে ও দেখিয়ে দেওয়া যে এভাবেও উযূ করা যায়। ফিক্হ্বিদদের পরিভাষায়-এর ধরনের উযূ জায়িয ও অনুমোদিত পদ্ধতি। তবে এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, পানির সংকট হেতু তিনি এরূপ উযূ করে থাকবেন।

٣٨- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَى هٰذَا – رواه البخارى

৩৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন উযূর প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করেছেন অধিকবার ধৌত করেন নি। (বুখারী)

٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ – رواه البخارى

৩৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার উযূর সময় প্রতিটি অঙ্গ দু'বার করে ধৌত করেছেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'টি হাদীসে কোন কোন সময় উযূর অঙ্গসমূহে কেবল একবার একবার অথবা দু'বার দু'বার ধৌত করার যে বিবরণ রয়েছে। তা মূলতঃ এটা দেখানোর উদ্দেশ্যে যে এতেও উযূ সম্পন্ন হয়ে যায়। অন্যথায় তিনি সাধারণতঃ উযূতে হাত মুখ এবং পা তিনবার করে ধৌত করতেন এবং অন্যকেও তা শিখিয়ে দিতেন। আর এ পদ্ধতিই সর্বোত্তম মাসনূন পদ্ধতি। নিম্নবর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

٤٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْئَلُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ ثُلثًا ثُلثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ - رواه النسائى وابن ماجة

৪০. আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত, তিনি (আমাদের দাদা) বলেছেন ঃ এক বেদুঈন ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উযূ সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি তাকে তিনবার করে (প্রত্যেক অঙ্গ ধুয়ে) দেখালেন। তারপর বললেন ঃ এভাবেই উযূ করতে হয়। কাজেই যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত করবে সে মন্দকাজ করল, সীমালংঘন করল এবং যুলুম করল। (নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূর অঙ্গসমূহ তিনবারের অধিক ধোয়া সম্পর্কে যে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন তার মূলকথা হল এই যে, উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করাতেই উযূ পূরোপুরি আদায় হয়ে যায়। সুতরাং কেউ যদি নিজের পক্ষ থেকে বাড়ায় সে যেন পক্ষান্তরে স্বেচ্ছায় শরী'আতে তার ইচ্ছা প্রবিষ্ট করালো। এহেন কাজ নিঃসন্দেহে অনুচিত ও বাড়াবাড়ি।

٤١- وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَيْنِ فَلَهُ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّأَ فَلَهُ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلثًا فَذٰلِكَ وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ - رواه احمد

৪১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। যে ব্যক্তি উমূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করে তার জন্য তা অবশ্য করণীয় (এটাই নিম্নতম পর্যায়, এটুকু ছাড়া উযূই হয়না)। আর যে ব্যক্তি দু'বার করে ধৌত করে তার জন্য রয়েছে (একবার করে ধৌতকারীর তুলনায়) দ্বিগুণ সাওয়াব। যে ব্যক্তি তিনবার করে উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করে (এটাই উত্তম

ও সুন্নাত তরীকা) এটাই আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের উযূ। (আমি উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করি, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণও তাই করতেন। (আহ্‌মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে রয়েছে। মুসনাদের আরেকটি বিবরণে আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করে দেখান এবং বলেন, এ হচ্ছে নিম্ন মর্যাদার উযূ- যা ব্যতীত আল্লাহ্‌র কাছে সালাতই গ্রহণযোগ্য হয় না। এরপর তিনি দু'বার করে উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করে দেখান এবং বলেন, প্রথম প্রকার উযূর চেয়ে এ উযূর সাওয়াব দ্বিগুণ। অতঃপর তিনি উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধুয়ে দেখান এবং বলেন, এ হচ্ছে আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের উযূ। এ বর্ণনাটি ইমাম দারু কুতনী, বায়হাকী, ইব্‌ন হিব্বান, ইব্‌ন মাজাহ (র) প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। (যুজাজাতুল মাসাবীহ্) এ দু'টি বর্ণনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র।

উযূর সুন্নাত ও আদবসমূহ

উযূতে চার ফরয- এর বিবরণ সূরা মায়িদায় উল্লিখিত আয়াতে রয়েছে, যাতে সালাতের প্রথম উযূর স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। উযূর চারটি ফরয হল এই, ১. মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২. উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা ৩. মাথা মাসেহ্ করা এবং ৪. উভয় পায়ের গিরা পর্যন্ত ধৌত করা। এ চারটি ফরয ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূতে যে সকল কাজের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তা-ই হচ্ছে মূলতঃ উযূর সুন্নাত ও আদব। যার দ্বারা উযূর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণতা অর্জিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মুখমণ্ডল, হাত-পা একবারের পরিবর্তে তিনবার করে ঘষেঘষে ধোয়া, দাড়ি এবং হাত পায়ের আঙ্গুলের মাঝে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করিয়ে খিলাল করা,পরিহিত আংটি নাড়াচাড়া করা যাতে পানি পৌঁছার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে; এমনিভাবে কুলি করা, উযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা, ভাল করে নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, কানের ভিতর ও বাইরের অংশ মাসেহ্ করা, উযূ শেষে কালেমা শাহাদাত পাঠ করা এবং উযূ শেষে উযূর দু'আ পাঠ করা, এসবই উযূর সুন্নাত এবং আদব বা মুস্তাহাব বিষয়। এগুলোর মাধ্যমেই উযূ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক হাদীস পাঠ করা যাক।

٤٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ- رواه الترمذى وابن ماجة

৪২. সাঈদ ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূকালে আল্লাহ্র নাম নেবে না তার উযূ হবেনা। (তিরমিযী ও ইবন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম উম্মাতের অধিকাংশ মুজতাহিদের মতে, যে উযূতে গাফিলতি করে আল্লাহ্র নাম লওয়া ব্যতীত আদায় করা হয়ত অসম্পূর্ণ ও জ্যোতিবিহীন উযূ। আর অসম্পূর্ণ উযূ মূলতঃ আদায় না হওয়ারই নামান্তর। কিতাবুল ঈমানে এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ আলোচনা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা, ইব্ন মাসঊদ ও ইব্ন উমার (রা) সূত্রে যে হাদীস পরবর্তী নম্বরে বর্ণিত হবে তা থেকে এ কথা ফুটে উঠে যে, যে উযূ 'বিস্মিল্লাহ্' ব্যতীত সম্পন্ন করা হয়ত সর্বতোভাবে অনর্থক নয় তবে তা অন্তরে প্রভাব বিস্তার ও জ্যোতি সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُطَهِّرْ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِسْمَ اللّٰهِ لَمْ يُطَهِّرْ اِلاَّ مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ- رواه الدارقطنى

৪৩. হযরত আবূ হুরায়রা, ইব্ন মাসঊদ ও ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করার সময় 'বিস্মিল্লাহ্' পাঠ করল সে তার সর্বাঙ্গ পবিত্র করে নিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উযূ করল অথচ বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করল না যে কেবল তার উযূর অঙ্গ সমূহ-ই পবিত্র করে নিল। (দারু কুতনী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যে উযূতে 'বিস্মিল্লাহ্' কিংবা অনুরূপ কোন বাক্য পাঠ করা হয় তার প্রভাবে সর্বাঙ্গ পূতপবিত্র ও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যে উযূ আল্লাহ্র নাম কিংবা অনুরূপ কোন বাক্য উচ্চারণ হীনভাবেই সম্পন্ন হয় তাতে কেবল উযূর অঙ্গ সমূহ-ই পবিত্র হয়। মোটাকথা এরূপ উযূ এক প্রকার অসম্পূর্ণ উযূ।

٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاِنَّ حَفَظَتَكَ لاَ تَبْرَحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتّٰى تُحْدِثَ مِنْ ذَالِكَ الْوُضُوْءِ- رواه الطبرانى فى الصغير

৪৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! উযূকালে তুমি 'বিস্মিল্লাহ্ ও আল্-হামদু লিল্লাহ্' পাঠ করবে। এরূপ উযূ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমল লেখক ফিরিশ্তা তোমার আমলনামায় সাওয়াব লিখতে থাকবে। (তারারানীর মু'জামুস সাগীর)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি উযূকালে বিস্মিল্লাহ্ ও আল্-হামদুলিল্লাহ্ পাঠ করে এবং ঐ উযূ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তার আমলনামায় অব্যাহতভাবেই আমল লেখক ফিরিশতা সাওয়াব লিখতে থাকবেন।

٤٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَفَابْدَءُ وَبِمِيَامِنْكُمْ-- رواه أحمد وأبو داؤد

৪৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার যখন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে এবং উযূ করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে। (আহ্মাদ ও আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হচ্ছে যে, যখন কোন পোশাক, জুতা, মোজা, কিংবা অনুরূপভাবে যখন উযূ করা হয় তখন ও প্রতিটি অঙ্গ ডান দিক থেকে শুরু করা উচিৎ।

٤٦- عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَوَخَلِّلْ بَيْنَ الاَصَابِعِ وَ بَالِغْ فِىْ الاِنْتِشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا - رواه أبوداؤد والترمذى النسائى

৪৬. লাকীত ইব্ন সাবিরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে উযূ সম্পর্কে অবহিত করুন (যেগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে) । তিনি বললেন ঃ (প্রথমতঃ গোটা) উযূ উত্তমরূপে করবে। (দ্বিতীয়ত) আঙ্গুলসমূহের মধ্যে খিলাল করবে এবং (তৃতীয়ত) সিয়াম পালনকারী না হলে নাকের মধ্যে ভালভাবে পানি পৌঁছিয়ে তা পরিষ্কার করবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

٤٧- عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ --- رواه الترمذى وأبوداؤد ابن ماجة

৪৭. হযরত মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযূ করার সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর হাতের ছোট আঙ্গুল দ্বারা দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যেকার স্থান ঘষতে দেখেছি। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ)

٤٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ - رواه أبوداوٗد

৪৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উযূ করতেন তখন এক আঁজলা পানি নিতেন। তারপর তা চিবুকের নিচ দিয়ে দাড়ির ভিতরের অংশে পৌঁছাতেন এবং তা দ্বারা দাড়ি খিলাল (আঙ্গুল ভিতরে ঢুকিয়ে বের) করতেন। এরপর তিনি বলতেন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ)

٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنُهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرُهُمَا بِاِبْهَامَيْهِ - رواه النسائي

৪৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ উযূতে মাসেহ্ করেছেন মাথা এবং দুই কান, দুই কানের ভেতরের দিক দুই শাহাদত আঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা এবং বাইরের দিক বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা । (নাসায়ী)

٥٠- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ حُجْرَىْ اُذُنَيْهِ - رواه أبوداوٗد وأحمد وابن ماجة

৫০. হযরত রুবাই বিনত মু'আওয়িয (রা) থেকে যে, নবী করীম ﷺ উযূ করার সময় দু'টি আঙ্গুল তাঁর দু'কানের ভেতরে ঢুকাতেন। (আবূ দাঊদ, আহ্মাদ ও ইব্ন মাজাহ)

٥١- عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلٰوةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِىْ اِصْبَعِهِ - رواه الدار قطنى وابن ماجة

৫১. হযরত আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতের জন্য উযূ করতেন তখন তাঁর আঙ্গুলে পরিহিত আংটি নাড়াচাড়া করতেন। (দারু কুতনী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীসসমূহে উযূর বিবরণ দানের সাথে সাথে যে যে আমলের বিষয় বর্ণিত হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ দাড়ি এবং হাত পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা, কানের ভিতর ও বাইরের অংশ ভালভাবে মাসেহ্ করা এবং ভিতরে আঙ্গুল ঢুকানো, হাতে পরিহিত আংটি নাড়াচাড়া করা, এসবই উযূ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আদব। এসব বিষয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যত্নবান ছিলেন এবং তাঁর বাণী ও কাজের মাধ্যমে অন্যদেরকে শিক্ষাও দিয়েছেন।

উযূতে নিষ্প্রয়োজনে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার অনুচিত

٥٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَاسَعْدُ! قَالَ اَفِىْ الْوُضُوْءِ سَرَفٌ؟ قَالَ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ- رواه أحمد وابن ماجه

৫২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী কারীম ﷺ সা'দ (রা) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সা'দ (রা) তখন উযূ করছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঃ হে সা'দ! এরূপ অপচয় করছ কেন? তিনি (সা'দ) বললেন ঃ উযূতেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আছে, যদিও তুমি প্রবহমান নদীর তীরে অবস্থান করে থাক। (আহ্মাদ ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পানি ব্যবহারে যাতে অপচয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উযূর নিয়ম-কানূনের অন্যতম।

উযূর পর তোয়ালে বা রুমাল ব্যবহার করা

٥٣- وَعَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرْفِ ثَوْبِهِ -- رواه الترمذى

৫৩. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি যে, তিনি উযূ করে তাঁর একটি কাপড়ের কিনারা দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করার পর কাপড়ের এক অংশ স্বীয় চেহারা মুবারক মুছে নিতেন। ইমাম তিরমিযী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উযূ শেষে উযূর অঙ্গসমূহ মুছে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আলাদা কাপড় রাখতেন এবং প্রয়োজনে তা

ব্যবহার করতেন। কোন কোন সাহাবী থেকে কাপড় কিংবা রুমাল রাখার বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি রুমালের মত আলাদা কাপড় এবং কখনো কখনো তিনি নিজ কাপড়ের এক কিনারা কাজটি সম্পাদন করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

প্রত্যেক উযূ শেষে আল্লাহ্র কিছু যিক্র ও সালাত আদায় করা

১৭নং ক্রমিকে ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) সূত্রে ইব্ন উমার (রা) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে উযূ শেষে কালেমা শাহাদাত ও দু'আ মাসূরা পাঠ করার বিবরণী রয়েছে। সেখানে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ –

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল কর" এর ফযীলত ও বরকত সম্পর্কীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে। উসমান (রা) সূত্রে ৩৬ নং ক্রমিকে বুখারী ও মুসলিমের বরাতে একই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উযূ করার পর একাগ্রতার সাথে দু'রাক'আত সালাত আদায়ের ফলে জীবনের (সাগীরা) গুনাহসমূহ বিমোচিত হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ক আরেকটি হাদীস পাঠ করা যাক ঃ

٥٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلَامِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ اِلاَّ وَصَلَّيْتُ بِذَالِكَ الطُّهُوْرِ مَاكُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ – رواه البخارى ومسلم

৫৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা) কে বললেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর যে আমল দ্বারা তুমি জান্নাতের সব চাইতে বেশি আশা কর, সে বিষয় আমাকে অবহিত কর। কারণ জান্নাতে আমি তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। এটা তোমার কোন আমলের বরকত তা জানতে চাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ আমি যার দ্বারা জান্নাতের সব চাইতে বেশী আশা করতে পারে। তা হল রাতে হোক কি দিনে যখনই আমি উযূ করি তখন কিছু সালাত আদায় করি যা আমার তাওফীক হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক জান্নাতে হযরত বিলাল (রা)-এর পদধ্বনি শোনার বিষয়টি স্বপ্নে দেখা একটি ঘটনা। ১. এ বিষয়ে এজন্য জানিয়ে দেয়া হল যে, জীবিত থাকা অবস্থায় হযরত বিলাল (রা) কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করলেন, সে প্রশ্ন যাতে উত্থাপিত না হয়। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নবী করীম ﷺ কর্তৃক হযরত বিলাল (রা) কে জান্নাতে দেখা এবং তার বিবরণ দান একথারই সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত বিলাল (রা) জান্নাতী। বরং তিনি প্রথম শ্রেণীর জান্নাতীদের অন্যতম।

এ হাদীসের আধ্যাত্মিক দিক হলো এই যে, মানুষ যখনই উযূ করে তখনই যেন সে তার সাধ্য অনুসারে সালাত আদায় করে, চাই ফরয হোক কি নফল কিংবা সুন্নাত।

১. যে সকল বিবেচনায় বিষয়টিকে নবী করীম ﷺ এর স্বপ্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে তার সবিস্তার বিবরণ জানার জন্য ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য।

অপবিত্রতা এবং অপবিত্রতার গোসল

প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ও আধ্যাত্মিকবোধ সম্পন্ন মানুষের শরীরের কোন অংশ থেকে যখন দুর্গন্ধময় বস্তু নির্গত হয় অথবা সহজাত পাশবিক ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে যা ঊর্ধ্বজগত থেকে অনেক দূরে, তখন, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অভ্যন্তর ভাগে এক ধরনের অন্ধকার, মালিন্য ও অপবিত্রতা অনুভব করে। এমতাবস্থায় সে নিজকে ইবাদতের যোগ্য মনে করে না একেই বলা হয় 'হাদ্স' (অপবিত্রতা)। এ হাদ্স (অপবিত্রতা) দু'প্রকার। যথাঃ- ১. হাদ্সে আসগার– যা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য কেবল উযূই যথেষ্ট অর্থাৎ উযূ দ্বারা গ্লানি দূরীভূত হয়ে যায়। ২. অপরটি হচ্ছে 'হাদ্সে আক্বার'। এর প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। এ অপবিত্রতা কেবল গোসল দ্বারা দূরীভূত হয়। পেশাব পায়খানা, বায়ু নির্গত হওয়া ইত্যাদি হাদ্স আসগারের এবং স্ত্রী সহবাস, হায়িয, নিফাস ইত্যাদি হাদ্সে আকবারের অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রী সহবাস, হায়িয, নিফাস ইত্যাদির ফলে মানব অন্তরে যে কদর্য তার সৃষ্টি হয় তা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক রুচিসম্পন্ন মানুষ গোসল অত্যাবশ্যক মনে করে এবং যতক্ষণ তারা গোসল না করে ততক্ষণে কোন পবিত্র কাজে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজকে অনুপযুক্ত মনে করে। এমনকি পবিত্র স্থান দিয়ে বিচরণ থেকে নিজকে বিরত রাখে। এ সকল অবস্থায় গোসল করে পবিত্র হওয়ার বিষয়টি যে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত তা সুস্থ বিবেকের অপরিহার্য দাবি। এ

সকল অবস্থায় গোসলের পূর্বে সালাত আদায়, কুরআন কিংবা ওযীফা পাঠ এবং মসজিদে প্রবেশেও রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক হাদীস পাঠ করা যাক।

٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ -

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ ঋতুমতী নারী ও অপবিত্র ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয) কুরআনের কোন অংশ পাঠ করবে না। (তিরমিযী)

٥٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّيْ لاَ اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ -- رواه أبو داؤد

৫৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এই সকল ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নাও। কারণ আমি মসজিদকে ঋতুমতী নারী ও অপবিত্র ব্যক্তির জন্য বৈধ মনে করি না। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম যখন মসজিদে নববীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়, তখন অসংখ্য ঘরের দরজা মসজিদে মুখী ছিল। মসজিদের প্রাঙ্গণের দিকেই তা খুলত। কিছুদিন পর এ নির্দেশ জারী হয় যে, মসজিদের সম্মানের খাতিরে কোন ঋতুমতী ও অপবিত্র লোক যেন আনাগোনা না করে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এফরমান জারী করলেন যে, এ সকল দরজা মসজিদ মুখী অবস্থান থেকে সরিয়ে যেন অন্য মুখী করা হয়।

অপবিত্র ব্যক্তির গোসল পদ্ধতি ও আদব

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথাও কাজের মাধ্যমে যেমন উযূর নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তদ্রুপ গোসলের নিয়ম কানূন ও শিক্ষা দিয়েছেন। এ পর্যায়ে কয়েকটি হাদীস পাঠ করা যাক।

٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ كُلِّ شَعْرٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَةَ -

৫৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি চুলের নিচে অপবিত্রতার প্রভাব থাকে। অতএব চুলগুলো ভাল করে ধৌত কর (যেতে চুলের নিচের শরীরের অংশও ভাল করে পরিষ্কার হয় যায়) (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ)

٥٨- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ، قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِيْ فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلٰثًا - رواه أبوداؤد وأحمد والدارمى اِلاَّ اَنَّهُمَا لَمْ يُكَرِّرَا فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ -

৫৮. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপবিত্র (জানাবাতের) গোসলের একচুল পরিমাণ স্থানও ছেড়ে দেবে এবং ধুইবে না তাকে জাহান্নামের এই শাস্তি দেয়া হবে। আলী (রা) বলেন, (একথা শুনে) আমি আমার মাথার চুলের সাথে বৈরী আচরণ করে আসছি (অর্থাৎ চুল বাড়ার সাথে সাথে তা মুড়িয়ে ফেলি। (আবূ দাউদ) আহমাদ ও দারেমী) আবূ দাউদের বর্ণনা মতে একথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে একচুল পরিমাণ স্থানও যাতে শুকনা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। কোন কোন ভাষ্যকার বলেন, যদিও ঘাড় বরাবর চুল রাখা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং অপর তিন খলীফার নিয়মিত আমল ছিল। তথাপি সর্বাঙ্গ ভালভাবে ধৌত করার উদ্দেশ্য হযরত আলী (রা) তাঁর মাথা মুণ্ডনের যে সাধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা অবলম্বন করা জায়িয এবং পসন্দনীয়ও বটে।

٥٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَءُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَاْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِيْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنْ قَدِاسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلٰى رَاسِهِ ثَلٰثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ - رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم

৫৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নাপাকীর গোসল করতেন তখন এভাবে শুরু করতেনঃ প্রথমে দু'হাত কব্জী পর্যন্ত ধুতেন, তারপর বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ধুতেন এবং ডান হাত দিয়ে পানি ঢালতেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করে নিতেন। এরপর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবাতেন এবং তা দ্বারা চুলের গোড়া খিলাল করতেন যখন অনুভব করতেন যে সর্বত্র পানি পৌঁছে গিয়েছে তখন মাথার উপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিতেন। এরপর সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিতেন। তারপর দু'পা ধুয়ে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা মুসলিমের)

٦٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الاِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثَ حَفَنَاتٍ مِلاَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَقَامِهِ ذَالِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ - رواه البخارى ومسلم وهذ اللفظ مسلم

৬০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার খালা মায়মুনা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নাপাকীর গোসলের জন্য পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি তাঁর উভয় হাতের কব্জী পর্যন্ত দু'বার অথবা তিনবার ধুইলেন। তারপর উভয় হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। এরপর লজ্জাস্থানে পানি ঢেলে দিলেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধুলেন। তারপর বাম হাত মাটিতে ভাল ঘষলেন। এরপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। তারপর তাঁর সারা শরীর ধুয়ে ফেললেন। তারপর সে স্থান থেকে একটু সরে তিনি দু'পা ধুয়ে নিলেন। তারপর আমি তাঁকে রুমাল দিলাম। কিন্তু তিনি তা ফেরত দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম কিন্তু শব্দমালা মুসলিমের)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) ও মায়মুনা (রা) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস দু'টি থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর গোসল পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ জানা গেল। অর্থাৎ তিনি নাপাকীর গোসল করার প্রাক্কালে প্রথমে দু' হাত দু'বার অথবা তিনবার ধুয়ে নিতেন (কেননা হাতের দ্বারা দেহের সর্বত্র পানি প্রবাহিত করা হয়।) তারপর তিনি লজ্জাস্থান বামহাত দিয়ে ধুয়ে নিতেন এবং ডানহাতে পানি ঢাললেন।

এরপর বামহাত মাটিতে ভাল করে ঘষে পানি দিয়ে আবার ধুয়ে নিতেন। পরে উযূ করে নিতেন। (উযূর প্রথমে তিনবার কুলি করে নিতেন। নাকে পানি দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নিতেন। অতঃপর চুলের গোড়া খিলাল করতেন এবং সর্বত্র পানি পৌঁছাতেন। তারপর অতীব যত্নের সাথে মাথার চুল ধুয়ে নিতেন এবং মাথার চুলের মূলে পানি পৌঁছাবার চেষ্টা করতেন। এরপর সারা দেহে পানি প্রবাহিত করতেন । এরপর গোসলের স্থান থেকে একটু সরে পা ধুয়ে নিতেন। বলাবাহুল্য, এ-ই হচ্ছে গোসলের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। গোসলের স্থান থেকে একটু সরে তিনি সম্ভবত এ জন্য পা ধুয়ে থাকবেন যে, গোসলের স্থান সাধারণত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না।

٦١- عَنْ يُعْلٰى قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيِىٌّ سَتِيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ -- رواه ابو داؤد والنسائى

৬১. হযরত ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে (বিবস্ত্র) অবস্থায় উন্মুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখে মিম্বারে উঠে দাঁড়ান। প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা- স্তুতি করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক লজ্জাশীল ও লজ্জানিবারক। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দা করাকে ভালবাসেন। সুতরাং কেউ গোসল করতে চাইলে যেন পর্দা করে নেয় (লোকের সামানে যেন বিবস্ত্র না হয়) ।(আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব গোসল

শরী'আতে যে যে আবস্থায় গোসল করা ফরয ও ওয়াজিব করা হয়েছে পূর্বেই তা বর্ণিত হয়েছে। এবং সে পর্যায়ে রাসূলূল্লাহ্ ﷺ এর হাদীসও পেশ করা হয়েছে। এছাড়াও রাসূলূল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন উপলক্ষে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তা ফরয কিংবা ওয়াজিব নয় বরং তা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব। এপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কতিপায় হাদীস পাঠ করা যাক।

জুমু'আর দিনের গোসল

٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، رواه البخارى ومسلم

৬২. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করতে এলে সে যেন গোসল করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ - رواه البخارى ومسلم

৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাতদিন অন্তর গোসল করে নেয়া উচিৎ এবং সে যেন তার গোসলের সময় তার মাথা এবং সমগ্র দেহ ভালভাবে ধুয়ে নেয়। (বুখারীও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দু'টিতে জুমু'আর দিনে গোসল করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, জুমু'আর দিন গোসল করা 'ওয়াজিব'। কিন্তু প্রাজ্ঞ আলিমগণের মতে, 'ওয়াজিব' দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয় বরং গুরুত্বারোপ করা উদ্দেশ্য। কারণ ইব্ন উমার ও আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসদ্বয় থেকে তা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ইরাকীদের এক প্রশ্নের উত্তরে যে জবাব দিয়েছেন তা উল্লেখ করলে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। সুনানে আবূ দাউদে ইব্ন আব্বাস (রা) এ প্রখ্যাত ছাত্র ইকরামা সূত্রে বিস্তারিত প্রশ্ন উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ।

ইকরামার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার ইরাকের কিছু সংখ্যক লোক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে ইব্ন আব্বাস! আপনি কি জুমু'আর দিনের গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন? তিনি বললেন ঃ না। তবে যে ব্যক্তি গোসল করবে তা হবে তার জন্য পবিত্র ও ভাল কাজ। আর যে ব্যক্তি গোসল করবে না সে গুনাহগার হবে না। কেননা তার উপর তা ওয়াজিবও নয়। কিরূপে জুমু'আর গোসলের সূচনা হয় আমি তোমাদের কে সে বিষয় অবহিত করছি। তদানীন্তন যুগের লোকেরা ছিল দরিদ্র এবং তারা মোটা পশমী কাপড় পরিধান করত। এতদ্ব্যতীত তাঁরা পিঠে বোঝা বহন করত। অথচ তাদের মসজিদ ছিল ছোট ও নিচু ছাদ বিশিষ্ট খেজুর শাখার ছাপড়া। এমতাবস্থায় একদিন প্রচণ্ড গরমে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হন। এমন সময় মোটা পশমী কাপড় পরিহিত লোকেরা ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাঁদের

শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল, যাতে অন্যান্য লোকদের কষ্ট হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুর্গন্ধ অনুভব করে বললেন ঃ হে লোক সকল। যখন এ দিন (জুমু'আর দিন) আসবে তখন তোমরা গোসল করবে এবং প্রত্যেকে সাধ্যানুসারে তেলও সুগন্ধি ব্যবহার করবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রাচুর্য দান করেন। ফলে তারা মোটা পশমী কাপড় ছাড়াও অন্য কাপড় পরিধান করতে থাকে এবং তাদের সীমাহীন কষ্টেরও অবসান ঘটে তাঁদের মসজিদও সম্প্রসারিত করা হয় এবং একের দ্বারা অন্যের ঘামে কষ্ট পাওয়ার বিষয়টিও তিরোহিত হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ আব্বাস (রা)-এর এ ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের বর্ণিত আবস্থায় জুমু'আ বারে গোসল করা অত্যাবশ্যক ছিল। তারপর যখন উক্ত অবস্থার অবসান ঘটে, তখন ঐ বিধানও রহিত হয়ে যায়। মোটকথা, পবিত্র অবস্থা আল্লাহ্‌র কাছে সব সময়ের জন্যই পসন্দনীয় এবং তাতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও সাওয়াব। অর্থাৎ এ ধরনের গোসল সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠবে।

٦٤- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ- رواه أحمد و أبوداؤد والترمذى والنسائى

৬৪. হযরত সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন উযূ করল সে ভাল কাজই করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গোসল করল, সে গোসলই হলো অধিকতর উত্তম কাজ। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও দারিমী)

(জুমু'আর সালাতের জন্য গোসল সংক্রান্ত হাদীস যখন আসবে তখন সেখানে আল্লাহ্ চাহেত কিছু আলোচনা করা যাবে)

মৃতের গোসলদাতার গোসল

٦٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ -- رواه ابن ماجة وزاد أحمد والترمذى وأبوداؤد ومن حَمَلَه فَلْيَتَوَضَّأْ -"

৬৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করায় সে যেন গোসল করে নেয়। ইব্ন

মাজাহ্ আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে যে ব্যক্তি মৃতের লাশ বহন করে সে যেন উযূ করে নেয়।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যে বিধান রয়েছে তা প্রাজ্ঞ আলিমদের মতে মুস্তাহাব। এজন্যই তাঁদের মতে, মৃতকে গোসল দানকারীর উচিৎ মৃতকে গোসল দানের পর গোসল করে নেয়া। কারণ মৃতকে গোসল দানের সময় তার শরীরে ছিটেফোটা লেগে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য একটি হাদীস ইমাম বায়হাকী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে মৃতকে গোসল দানের পর গোসলদাতার গোসল ওয়াজিব নয় বলে উল্লেখ রয়েছে। এজন্য আলিমগণ মৃতকে গোসল দানের পর গোসল করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। এ নির্দেশ এ কারণেই হয়ে থাকবে যে, মৃতের লাশ বহনকারীর জন্য জানাযার সালাত আদায়ের ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

ঈদের দিন গোসল

٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى - رواه ابن ماجه

৬৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করতেন। (ইব্ন মাজাহ)

জ্ঞাতব্য ঃ ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করা সাধ্যানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করার প্রচলন সম্ভবত ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই চলে আসছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ উম্মাতকে বাণী প্রদান করে এবং কার্যে পরিণত করে যে অনুপ্রেরণ দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ পর্যায়ে যে সকল হাদীস পাওয়া যায় সে সব সম্পর্কে হাদীস দুর্বল সনদ যুক্ত বলে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ অভিমত দিয়েছেন। এখানে ইব্ন মাজাহ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সনদ সূত্রও দুর্বল । এটা একটা সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত যে, কিছু সংখ্যক রিওয়ায়াতে পারিভাষিক দুর্বলতা থাকলেও তার বিষয়বস্তু যথার্থও প্রতিষ্ঠিত সত্য। কোন হাদীসের সনদ সূত্র যদি হাদীস বিশারদগণের নিকট দুর্বলও হয় , আর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা বিশুদ্ধ হাদীসে মত স্বীকৃতি পাবে। এবং দলীল প্রমাণরূপে গৃহীত হবে।

তায়াম্মুম

মানুষ কখনো এমন অবস্থার শিকার হয় যে, তার পক্ষে গোসল কিংবা উযূ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তা রোগজনিত কারণে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক। অনুরূপভাবে মানুষ কখনো এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছে যেখানে পানি পাওয়া কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। এ সকল অবস্থায় যদি বিনা গাসল কিংবা বিনা উযূতে সালাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তাতে স্বাভাবিক পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টি বর্জিতও উপেক্ষিত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র দরবারে পবিত্রতার সাথে হাযিরী পেশ করার যে অনুভূতি তা মানুষ হারিয়ে ফেলে। এতে মানুষের মনে এ উপস্থিতির গুরুত্ব ও মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এহেন পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য গোসল ও উযূর পরিবর্তে তায়াম্মুমকে স্থালাভিষিক্ত করেছেন। সুতরাং গোসল ও উযূ করত অপারগ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হওয়ার দাবি রাখে। ফলে নিরূপায় অবস্থায় তায়াম্মুম করতে বাধ্য হওয়ায় তার মন মানসিকতায় পবিত্রতার অনুভূতি বিলুপ্ত হবে না।

তায়াম্মুম করার নিয়ম হল, এই যে, ভূপৃষ্টে তথা, মাটি, পাথর বা বালির উপর হাত মেরে পবিত্রতার নিয়্যাতে মুখমণ্ডল এবং হাত মাসেহ্ করা। এভাবে মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ্ করলে তায়াম্মুম আদায় হয়ে যায়। তবে মুখমমণ্ডল ও হাতে মাটি লাগানো জরুরী নয় এবং মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত যাতে অপরিচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা চাই।

তায়াম্মুমের গুরুত্ব

গোসল ও উযূতে পানি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা অপারগ অবস্থায় তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছেন। আর এতে মাটিও পাথর ব্যবহৃত হয়। এর গূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে যেয়ে কিছু সংখ্যক প্রাজ্ঞ আলিম বলেন, পুরো ভূখণ্ড দু'অংশে বিভক্ত। এর বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে পানি এবং অপর অংশ জুড়ে রয়েছে মাটি। আর পানি ও মাটির মধ্যে রয়েছে নিবিড় সর্ম্পক। মানব সৃষ্টির সূচনা প্রধানত মাটি এবং পানি থেকেই হয়েছে। বলাবাহুল্য, সমুদ্র ব্যতীত সর্বত্র মানুষ হাতের নাগালে মাটি পাচ্ছে। এ কথাও সত্য যে, হাতে মাটি লাগিয়ে হাত এবং মুখমণ্ডল মাসেহ্ করার মধ্য দিয়ে আরো অধিক দীনতা-হীনতা প্রকাশ পায়। তাছাড়া মানুষের শেষ ঠিকানা মাটিতেই হবে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে,তায়াম্মুম করার ফলে মৃত্যু ও কবরের কথা স্মরণ হয়। তবে এর প্রকৃত রহস্য আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জ্ঞাত।

এ পর্যায়ে তায়াম্মুম সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীস পাঠ করা যাক। প্রথমতঃ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ঐ ঘটনার উল্লেখ কর যার প্রেক্ষিতে তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয়।

তায়াম্মুমের বিধান

٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَاَتَى النَّاسُ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالُوْا اَلَا تَرَى اِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْبَكْرٍ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيْ قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِيْ اَبُوْبَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَاللّٰهَ اَنْ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَلَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلَّا مَكَانَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذِيْ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ اُسَيْدُبْنُ الْحُضَيْرِ وَ هُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ مَاهِيَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَاٰلَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ - رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم

৬৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে (গ্রহণযোগ্য মতে যাতুর রিকা' অভিযান কালে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শ (মদীনা ও খায়বারের মধ্যবর্তী দু'টি স্থান) নামক স্থানে পৌঁছলাম। তখন আমার (আমার বড় বোন আস্মা থেকে ধারকৃত) গলার হার (ছিড়ে পড়ে) হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তা জানালে (তিনি) তা তালাশ করতে করতে সেখানে থেমে গেলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সাথে থেমে গেল। তাঁদের কাছাকাছি কোথাও পানি ছিলনা। তারপর লোকজন (আমার পিতা) আবূ বকর (রা) এর কাছে এসে বলতে লাগল, আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে, আয়েশা কি করেছেন? তিনি তো (হার হারিয়ে ফেলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আটকে দিয়েছেন এবং সেই সাথে সমস্ত লোককে আটকা থাকতে বাধ্য করেছেন। অথচ কাছাকাছি কোথাও পানি নেই আর সেনাদলের

সাথেও পানি নেই। তারপর আবূ বকর (রা) আমার কাছে আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমার উরুর উপর মাথা রেখে আরাম করছিলেন। তিনি এসে বললেন ঃ তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং লোকদেরকে আটকে রেখেছ অথচ তাঁরা না পানির কাছাকাছি, আর না তাঁদের কাছে পানি আছে। আয়েশা (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং যা বলার তা বললেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার পাঁজরে আঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে ছিলেন বলে আমি মোটেই নড়াচড়া করি নি পাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এমনি করে পানি বিহীনভাবে সকাল হলো। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। তখন সকলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। বায়'আতে আকাবার অন্যতম দলপতি উসায়দ ইব্ন হুযাইর (রা) বলেন, হে আবূ বাকর তনয়া। এটাই আপনার প্রথম বকরত নয় (এর পূর্বে ও আপনার মাধ্যমে উম্মত বহু বরকত লাভ করেছে)। আয়েশা (র) বলেন এরপর আমি যে উটের উপর ছিলাম সেটিকে চলার জন্য উঠালে উক্ত হারটি তার নিচে পাওয়া গেল। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা মুসলিমের।)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে যে তায়াম্মুমের আয়াত সম্পর্কে ইঙ্গিতে দেয়া হয়েছে তা সম্ভবত সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا-

"তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা মুখ ও হাতে মাসেহ্ করবে। আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।" (৪, সূরা নিসা ঃ ৪৩)

সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ সূরা মায়িদার দ্বিতীয় রুকূতে ও অনুরূপ আয়াত রয়েছে। কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মায়িদার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে সূরা নিসায় বর্ণিত আয়াতই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর সূরা মায়িদার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٦٨- عَنْ عَمَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّيْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ اَمَا تَذْكُرُ لَنَا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ

اَنَا وَاَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ هٰذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - رواه البخارى ومسلم

৬৮. হযরত আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি উমর (রা) এর নিকট এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি কিন্তু পানি পাচ্ছি না (সুতরাং এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?)। তখন (সেখানে উপস্থিত) আম্মার (রা) উমর (রা) কে বললেন ঃ আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমি ও আপনি কোন এক সফরে ছিলাম। সে সফরে (আমাদের উভয়ের গোসলের প্রয়োজন হয়) আপনি সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম (কেননা আমার ধারণায় তায়াম্মুমে গোসলের মত সারা দেহসহ করতে হয়) এবং সালাত আদায় করে নিলাম। আমি (সফর থেকে ফিরে এসে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ বিষয় অবহিত করলে তিনি জানালেন যে, তোমার জন্য (সারা দেহের পরিবর্তে) এটাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে নবী কারীম ﷺ তাঁর দু'হাত যমীনে মেরে তা থেকে ধূলাবালি ঝেড়ে ফেলেন। এরপর উভয় হাত দ্বারা তাঁর চেহারাও দু'হাত মাসেহ্ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তাতে হযরত উমর (রা)-এর সালাত আদায় না করার ব্যাপারে ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, সম্ভবত তিনি পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং এ ব্যাপারে খানিকটা আশাবাদীও ছিলেন। এ জন্যই তিনি ঐ সময় তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করা সমীচীন মনে করেননি। আর হযরত আম্মার (রা) তখনও জানতেন না যে, নাপাকীর গোসলের জন্য যে তায়াম্মুম করতে হয় তাও উযূর মত। এজন্য তিনি নিজ ইজ্‌তিহাদের নিরিখে মাটিতে গড়াগড়ি করেন। তারপর যখন তিনি তাঁর অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অবহিত করেন, তখন তিনি তার ভুল সংশোধন করে দেন এবং বলেন, উযূর বিপরীতে তায়াম্মুমে যে সকল অঙ্গ মাসেহ্ করতে হয়, নাপাকীর গোসলের বিপরীতেও ঠিক একইভাবে যে সব মাসেহ্ করে নিতে হয়। হযরত আম্মার (রা) উযূর বিপরীতে তায়াম্মুম সম্পর্কীয় বিষয় অবহিত ছিলেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সে ব্যাপারে শুধু ইঙ্গিত করলেন।

হযরত আম্মার (রা) বর্ণিত এ হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, তায়াম্মুমে ধূলা বিযুক্ত হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ্ করা করা জরুরী নয়। বরং মাটিতে হাত রাখার পর উক্ত ধূলা ফুঁক দিয়ে মসেহ্ করাই উত্তম।

(٦٩) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذَالِكَ خَيْرٌ - رواه أحمد وأبوداؤد

৬৯. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। যখন পানি পাবে সে যেন তার শরীরে তা (অর্থাৎ উযূ গোসল করে) এটাই তার জন্য উত্তম। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি দশ বছর ধরে উযূ অথবা গোসলের জন্য পানি না পায় তার জন্য তায়াম্মুই যথেষ্ট। তবে পানি পাওয়া গেলে তা দ্বারাই গোসল অথবা উযূ করে নেয়া জরুরী হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ প্রায় সারা উম্মাত এ ব্যাপারে একমত যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয কিন্তু পানি না পাওয়া কিংবা রোগগ্রস্ত হয় তবে সে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। তারপর পানি পাওয়া গেলে অথবা রোগ নিরাময় হয়ে গেলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব হবে।

٧٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِىْ الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ وَلَمْ يُعِدِ الاٰخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَالِكَ فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاَتْكَ صَلٰوتُكَ وَقَالَ لِلَّذِىْ تَوَضَّأَ وَ اَعَادَ لَكَ الاَجْرُ مَرَّتَيْنِ - رواه أبوداؤد والدارمى

৭০. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে সালাতের সময় হল, কিন্তু তাঁদের নিকট পানি ছিল না। সুতরাং তাঁরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নিলেন। এরপর তাঁরা সালাতের সময়ের মধ্যেই পানি পেলেন। তাঁদের একজন উযূ করে সালাত আদায় করলেন এবং অপরজন পুনঃসালাত আদায় করলেন না। তারপর উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এলেন এবং তাঁর কাছে ঘটনাটি অবহিত করলেন। যে ব্যক্তি পুনঃ সালাত আদায় করেন নি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছ এবং তোমার সেই সালাতই তোমার জন্য যথেষ্ট (বিধি মতে এরূপ অবস্থায় তায়াম্মুমসহ সালাত আদায় যথেষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে পানি পেলেও দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করতে হয়না) জন্য যথেষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উযূ করে পুনঃ সালাত আদায় করেছিলেন তিনি তাঁকে বললেন ঃ তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার (কেননা তোমার দ্বিতীয় বারের সালাত বদল বলে গণ্য হবে) (আবূ দাঊদ ও দারিমী)।

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাত অধ্যায়

الله اكبر -আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ

"سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ"

"হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য যাবতীয় পবিত্রতা ও প্রশংসা, তোমার নাম বরকতময়। তুমি মহান মর্যাদার অধিকারী। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।"

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমার প্রতিপালক। আমার প্রার্থনা কবূল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! যে দিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনদের ক্ষমা করে দিও।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪০-৪১) আমীন হে দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সালাতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য

নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী মাহাত্ম্য ও অনুগ্রহসমূহ, পবিত্রতা ও একত্ববাদ সম্পর্কে যা বলেছেন তা মেনে চলা এবং ঈমান আনার প্রথম সহজাত দাবি এই যে, মানুষ যেন নিজকে তাঁর জন্য উৎসর্গ করে, ইবাদত, ভালবাসা ও বিনয় নম্রতা প্রকাশ করে, তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং তাঁকে স্মরণের মধ্য দিয়ে নিজ অন্তর আত্মাকে জ্যোতির্ময় করে তোলে। এটাই সালাতের প্রকৃত বিষয়বস্তু। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এলক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সালাত শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর এজন্য প্রত্যেক নবী-রাসূলের শিক্ষা এবং শরী'আতে আনার পর প্রথম করণীয়রূপে সালাতকে নির্ধারিত করা হয়েছে। তাই

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ আনীত শরী'আতেও সালাতের শর্তাবলী, রুক্নসমূহ, সুন্নাতসমূহ, নিয়মকানূন এবং সালাত ভঙ্গের ও মাকরূহ হওয়ার বিষয় সবিস্তার বিবরণ গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে। একে এমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন ইবাদতকে দেওয়া হয়নি। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার সালাতের বিবরণের শুরুতে বলেছেন–

"জেনে রেখ, মর্যাদা, দলীল-প্রমাণ ও আল্লাহ্ ভীরু মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধির দিক থেকে সালাত বিশিষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর এরই মাঝে নিহিত রয়েছে মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপকারিতা। এজন্যই শরী'আতে সালাতের নির্দিষ্ট সময়, শর্ত, রুক্ন, নিয়ম-কানূন আদব ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। অপরাপর ইবাদতের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে এত গুরুত্বারোপ করা হয়নি। সালাতের বিশেষ অবস্থানিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রে কারণে একে দীলের বিশেষ প্রতীকরূপে গণ্য করা।"

উক্ত গ্রন্থের অন্য একস্থানে সালাতের মৌলিক দিকের হাকীকত বর্ণনা করে বলা হয়েছে" সালাতের মূল বিষয় তিনটি। যথা–

(ক) আল্লাহ্ তা'আলার অপার মাহাত্ম্য ও অশেষ ক্ষমতার বিষয় অনুধাবন করে অন্তরে পরম বিনয় ও ভীতি পোষণ করা।

(খ) আল্লাহ্র মাহাত্মের সামনে সেই বিনয় ও ভীতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মুখে প্রকাশ করা।

(গ) সেই ভীতি ও বিনয় মুতাবিক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে আমাদের মাহাত্ম্য ও নিজের ক্ষুদ্রতার সাক্ষ্য দেওয়া।"

তিনি আরো বলেন সালাতের হাকীকত তিনটি বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। যথাঃ–

(ক) আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের কথা নিজ চিন্তায় স্থান দেয়া।

(খ) এমন কতিপয় দু'আ ও যিক্র- আযকার করা, যার মাধ্যমে বান্দার বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নিবেদিত হওয়া এবং নিজ মন মানসিকতা একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্ অভিমুখী করে তোলা বুঝায়। তাছাড়া নিজ চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাওয়া।

(গ) সালাতের কতিপয় মর্যাদাপূর্ণ কাজ যেমন রুকূও সিজ্দা ইত্যাদি ইবাদতে পূর্ণতার এবং আল্লাহ্ অভিমুখী করে তুলতে অনুপ্রাণিত করে।"

এরপরে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) সালাতের আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্যও প্রভাব বিস্তারকারী দিক তুলে ধরেছেন।

(ক) সালাত ঈমানদারের জন্য মি'রাজ। আখিরাতে মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্র যে দীদার লাভ করবে তার যোগ্যতা সৃষ্টির ব্যাপারে সালাতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

(খ) সালাত আল্লাহ্র ভালবাসা ও রহমত প্রাপ্তির মাধ্যম।

(গ) কোন মানুষের মধ্যে যখন সালাতের হাকীকত অর্জিত হয় এবং সালাত তার আত্মায় প্রভাব বিস্তার করে তখন বান্দা আল্লাহ্র জ্যোতির মধ্যেই প্রকারান্তরে ডুব দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে। যেমন ময়লা বিযুক্ত বস্তু নদীতে নিমজ্জিত করার ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় অথবা মরিচা বিযুক্ত লোহা যেমন হাপ দ্বারা পরিষ্কার করা হয়।

(ঘ) অন্তরের একাগ্রতা এবং বিশুদ্ধ নিয়্যাতের সাথে সালাত আদায় জড়তা, কুচিন্তা এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনা দূরকরণের অনুপম পদ্ধতি অব্যর্থ ঔষধ।

(ঙ) হযরত মুহাম্মদ ﷺ সালাতকে মুসলিম উম্মাতের সাধারণ ইবাদত ঘোষণা করায় তা কুফ্র, শির্ক, ফিস্ক ও ভ্রষ্টতার জাল থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটি অনন্য উপায় সাব্যস্ত হয়েছে এবং তা মুসলমানের জন্য এমন একটি স্বাতন্ত্র্য রূপ পরিগ্রহ করেছে যা দ্বারা কাফির এবং মুসলমানের মধ্যে পৃথক পরিচিত তুলে ধরা যায়।

(চ) মানুষের স্বভাবকে বুদ্ধিবৃত্তির অনুগামী করার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সালাত বিশেষ মাধ্যমরূপে বিবেচিত।

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) সালাতের যে সব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা মূলত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিভিন্ন বাণী থেকে নেয়া এবং তিনি সবগুলোর বরাতও দিয়েছেন। এসব হাদীস পরে আসবে বিধায় এখানে উল্লেখ করিনি।

সালাতের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) সূত্রে উপরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা আমি (গ্রন্থকার) যথেষ্ট মনে করছি। সুধী পাঠক হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর বাণী নিজ মননে ধারণ করে সালাত সম্পর্কীয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস পাঠ করুন।

সালাত বর্জন ঈমানের পরিপন্থী এবং কুফরী কাজ

١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ-- رواه مسلم

১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী বস্তু হল সালাত বর্জন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সালাত দীনের এমন এক প্রতীক এবং ঈমানের এমন অনিবার্য দাবি যে, সালাত বর্জনের ফলে বান্দা যেন কুফ্‌রীর সীমায় পৌঁছে যায়।

٢- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلٰوةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ - رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه

২. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের ও ইসলাম কুবলকারী সাধারণ লোকদের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা হল সালাত (অর্থাৎ প্রত্যেক নও মুসলিমের নিকট থেকে ইসলামের প্রতীক সালাতের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়)। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত বর্জন করবে সে যেন ইসলামের পথ বর্জন করে কাফিরের পথ অবলম্বন করল। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ)

٣- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ اَنْ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تُشْرِكْ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

৩. হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরম বন্ধু (রাসূলুল্লাহ্ স) আমাকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে, তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না যদিও তোমাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয় বা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। স্বেচ্ছায় কখনো ফরয সালাত বর্জন করবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা বর্জন করবে তার থেকে নিরাপত্তা দূর হয়ে যাবে যা আল্লাহ্‌র ওরফ থেকে অনুগত মু'মিন বান্দাদের জন্য রয়েছে। মদ পান করবে না। কারণ তা হল, সকল অনিষ্টের মূল। (ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রে যেমনিভাবে প্রজা সাধারণের কতিপয় অধিকার রয়েছে। তারা বিদ্রোহের মত কোন গুরুতর অপরাধ করা পর্যন্ত ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে, একইভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় সকল মু'মিন-মুসলিমের জন্য কতিপয় বিশেষ নি'আমত দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। (যার বহিঃপ্রকাশ আখিরাতে হবে।) আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ দারদা (রা) কে লক্ষ্য করে বলেছেন, স্বেচ্ছায় সালাত বর্জন কেবল অন্যান্য পাপের মত একটি পাপ মাত্র নয় বরং তা এক ধরনের ঘোরতর বিদ্রোহ। যার

লে সালাত বর্জনকারী আল্লাহ্‌র যাবতীয় নি'আমত প্রাপ্তির অধিকার হারিয়ে ফেলে এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

একই বিষয়ের উপর অন্য একটি হাদীস ও হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ শব্দ ব্যবহার জোর তাগিদ দিয়েছেন। তবে উক্ত হাদীসের শেষ কথা এরূপ–"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সালাত বর্জন করবে সে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে।" (তাবারানী, আত্‌তারগীব ওয়াত তারহীব)

এসব হাদীসে সালাত বর্জনকে কুফ্‌র অথবা দীন থেকে বহিস্কারের যে, ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তার কারণ সম্ভবত এই সালাত ঈমানের এমনই একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন এবং ইসলামের বিশেষ প্রতীক, যা বর্জনের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সালাত বর্জনকারীর সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন সম্পর্ক নেই এবং সে নিজকে ইসলাম থেকে গুটিয়ে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় একথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করা যায় না যে, এক ব্যক্তি মু'মিন মুসলিম অথচ সে সালাত বর্জন করবে। এজন্য সে সময় কারো সালাত বর্জন একথারই প্রকাশ্য প্রমাণ ছিল যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান নয়। এখানে বিশিষ্ট তাবিঈ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাফীক (র) সাহাবা কিরাম সম্পর্কে যে বাণী প্রদান করেছেন তা উল্লেখের বিশেষ দাবি রাখে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ সালাত ব্যতীত কোন কাজ বর্জন করাকে কুফরী মনে করতেন না। (মিশকাত : বরাতে তিরমিযী)

এই অধমের মতে, এর মর্ম হল, সাহাবা কিরাম দীনের অপরাপর রুক্‌ন ও আমল যেমন সাওম, হাজ্জ, যাকাত, জিহাদ, এমনিভাবে আখ্‌লাক ও লেন-দেন সম্পর্কীয় বিষয়ে অসতর্কতাকে পাপের কাজ মনে করতেন। তবে সালাত যেহেতু ঈমানের অনিবার্য দাবিও আমলী প্রমাণ এবং দীনের অন্যতম প্রতীক তাই তা বর্জন করাকে দীনের অন্যতম প্রতীকতা বর্জন করাকে দীনের সাথে সম্পর্ক হীনতা ও বেরিয়ে যাবার লক্ষণ বলে মনে করতেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোকে ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এবং অপরাপর প্রাজ্ঞ আলিমের মতে, সালাত বর্জন করলে মানুষ নির্ঘাত কাফিরও মুরতাদ হয়ে যায় এবং ইসলামের সাথে তার আদৌ সম্পর্ক থাকেনা। এমনকি সে যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তার জানাযা নেই এবং মুসলিম গোরস্তান তার দাফনও হবে না। মোটকথা, তার অবস্থা মুরতাদ ব্যক্তির অনুরূপ হবে। এসকল মহান ব্যক্তিবর্গের মতে, কোন মুসলমাননের সালাত বর্জন প্রকারান্তরে কোন বা ক্রুশের সামনে সিজ্‌দা করা অথবা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

শানে বে-আদবীর শামিল। এতে মানুষ কাফির হয়ে যায় চাই তার বিশ্বাসে কোন পরিবর্তন আসুক আর নাই আসুক। অপরাপর ইমামগণের মতে, সালাত বর্জন যদিও কুফরী কাজ, ইসলামে যার স্থান নেই। তবে কোন হতভাগ্য লোক যদি অচেতনভাবে সালাত বর্জন করে কিন্তু অন্তরে সালাতের অস্বীকৃতি ভাব না জন্মে এবং বিশ্বাসে কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু পুরোপুরি অমুসলিম বলে গণ্য হবে না এবং তার উপর হদ্দের বিধানও কার্যকর হবে না। উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় এই সকল আলিম অভিমত দেন যে, সালাত বর্জনকে যে কুফ্‌র বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হল, কাজটি কুফরীর শামিল। এর ভয়াবহ শাস্তির কথা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য এ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ক্ষতিকর আহার্যের ব্যাপারে বলা হয় এ হচ্ছে বিষ পানের শামিল।

٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ اَمْرَ الصَّلٰوةِ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلاَ بُرْهَانًا وَلاَ نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ اُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ - رواه أحمد الدرمى والبهيقى فى شعب الايمان

৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা তিনি সালাত প্রসেঙ্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য তা জ্যোতি (কিয়ামতের অন্ধকারে সে আলো পাবে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের) প্রমাণ ও নাজাতের কারণ হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে না বরং গাফিলতি করল তা তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ কিংবা মুক্তির কারণ হবে না। সুতরাং কারূন, ফিরউন, হামান ও (মক্কার কাফিরদের অন্যতম নেতা) উবাই ইব্‌ন খালফের সাথে তার কিয়ামত হবে। (আহ্‌মাদ, দারিমী এবং বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ সালাত বর্জন এমন গুরুতর অপরাধ যার ফলে সালাত বর্জনকারী জাহান্নামে পৌঁছে যায় যেখানে ফির'আউন, হামান, কারূন ও উবাই ইব্‌ন খাল্‌ফের স্থান হবে। তবে সকল জাহান্নামীর শাস্তি কিন্তু একই রাখা হবে না। কারণ একটি জেলখানায় অনেক আসামী থাকলেও অপরাধ অনুসারে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি হয়ে থাকে। কেননা ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ "অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর।" (২৪, সূরা নূর ঃ ৪০)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়া এবং তা আদায়কারীকে ক্ষমা করার অঙ্গীকার

٥- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَلَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ- رواه أحمد وأبو داوٗد

৫. হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে যথাসময়ে সালাত আদায় করবে এবং যথার্থরূপে রুকূ ও সিজ্‌দা করবে এবং বিনয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট এ মর্মে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা করবে না (সালাতে গাফিলতি করে) তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন, নতুবা ইচ্ছা করলে শাস্তি ও দিতে পারেন। (আহ্‌মাদ ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ যে মু'মিন ব্যক্তি পূর্ণ গুরুত্ব ও একাগ্রতার সাথে উত্তমরূপে সালাত আদায় করবে সে প্রথমতঃ নিজকে পাপমুক্ত রাখল। এরপরেরও যদি সে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অথবা নফসের ধোঁকায় পড়ে কখনো শাস্তিযোগ্য পাপ করে, তথাপিও সালাতের বরকতে তাকে তাওবা ও ক্ষমার তাওফীক দেওয়া হবে (বাস্তবে এমন বহু ঘটনা ঘটতে দেয়া যায়)। এতদ্ব্যতীত সালাত তার পাপের কাফ্‌ফারা ও প্রতিবিধান হয়ে যাবে। এছাড়াও সালাত অপরাপর পাপের ময়লা পরিষ্কার করে বান্দাকে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতের হক্‌দার বানায়। কারণ সালাত এমন ইবাদত যাতে ফিরিশ্‌তারা ঈর্ষাবোধ করেন। সুতরাং যে লোক যাবতীয় শর্ত, নিয়ম কানূন পূর্ণ গুরুত্ব ভীতি ও একাগ্রতার সাথে সালাত করবে তার জন্য ক্ষমা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার দাবিদার অথচ সালাতের ব্যাপারে অসচেতন, তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা নিজ করুণায় ক্ষমা দিবেন। তবে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে এবং তার মুক্তি পাবার কোন নিশ্চয়তা নেই।

সালাত পাপ মোচন এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম

٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَئَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَئٌ قَالُوْا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَئٌ قَالَ فَذَالِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا - رواه البخارى ومسلم

৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কারো দরজায় পাশে একটি নদী থাকে এবং তাতে কেউ দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার দেহে ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবীগণ বললেন, কোন ময়লাই থাকতে পারে না। তিনি বললেন ঃ এই হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপমা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ (সালাত আদায়কারীর) পাপসমূহ মোচন করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তির যদি সালাতের হাকীকত নসীব হয়, তবে সে যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন যেন সে আল্লাহ্র রহমতের গভীর সমুদ্রেই ডুব দেয়। যেমন ময়লা ও দুর্গন্ধময় কাপড়-চোপড়ের ময়লা যেমন নদীর পানিতে দূরীভূত হয়ে যায়, তদ্রুপ সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে বান্দার অন্তরের ময়লাসমূহ দূর হয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্যোতিতে অন্তর জ্যোতির্ময় পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুতরাং কোন মানুষ যদি দৈনিক এই আমল করে, তবে তার দেহে বিন্দু পরিমাণ ময়লাও থাকতে পারে না। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণীর মর্ম এটাই। পরবর্তী হাদীসে নবী কারীম (সা.) একদা শীতের মওসূমে বের হন আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল।এ সময় তিনি একটি গাছের দু'টি শাখা , হাতে ধরেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সব পাতা ঝরে পড়ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন ঃ মুসলিম বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সালাত আদায় করে তখন তার পাপসমূহ বিমোচিত হয় যেভাবে এই গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (আহ্মাদ)

সূর্যের কিরণ ও মওসূমগত কারণে যেমন গাছের পাতা শুকিয়ে যায় এবং যৎসামান্য নাড়া দিলেই যেমন তা ঝরে পড়ে, অনুরূপ কোন মু'মিন লোক যদি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই সালাত আদায় করে, তবে আল্লাহ্র দীপ্তিময় জ্যোতি ও তার পাপরাশির দুর্গন্ধ দূর করে তাকে পূতপবিত্র করে তুলে।

٧- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَالِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَةُ قَالَ فَقَالَ

يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُبِهَا وَجْهَ اللّٰهِ تَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَهَافَةُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ- رواه أحمد

৭. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ একদা শীতের মওসূমে বের হন আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। এসময় তিনি একটি গাছের দু'টি শাখা হাতে ধরেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন ঃ মুসলিম বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশে সালাত আদায় করে তখন তার পাপসমূহ বিমোচিত হয়, যে ভাবে এই গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (আহ্মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ সূর্যের কিরণ ও মওসূমগত কারণে যেমন গাছের পাতা শুকিয়ে যায় এবং যৎ সামান্য নাড়া দিলেই যেমন ঝরে পড়ে অনুরূপ কোন মু'মিন লোক যদি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই সালাত আদায় করে। তবে আল্লাহ্র দীপ্তিময় জ্যোতি ও তার পাপ রাশির দুর্গন্ধ দূর করে তাকে পূতপবিত্র করে তুলে।

٨- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ امْرِءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلٰوةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً وَذَالِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ - رواه مسلم

৮. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তি ফরয সালাতের সময় হওয়ার পর উত্তমরূপে উযূ করে পূর্ণ বিণয় ও একাগ্রতা সহকারে ভালোভাবে রুকূ সিজ্দাসহ সালাত আদায় করবে, কবীরাগুনাহ না করার শর্তে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। আর সালাতের এ বরকত সুফল সব সময়ের জন্য অব্যাহত থাকবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, সালাত যথা নিয়মে আদায়ের ফলে তা পূর্ববর্তী গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় এবং পরবর্তী গুনাহসমূহ ও দূর হয়ে যায়। তবে শর্ত হল এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন কবীরা গুনাহকারী না হয়। কারণ কবীরাগুনাহ নাপাকী এত মারাত্মক ক্রিয়াশীল ও প্রভাবময়ী যে, যার ক্ষতিপূরণ কেবল তাওবার মাধ্যমেই হতে পারে। তবে আল্লাহ্ যদি নিজ দয়ায় এমনি ক্ষমা করে দেন, তবে তাতে কিছু বলার নেই।

সালাতের বিনিময়ে জান্নাত ও মাগফিরাতের অঙ্গীকার

٩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ---- رواه مسلم

৯. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন উত্তমরূপে উযূ করে তারপর অন্তর ও চেহারা আল্লাহ্ অভিমুখী করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিক্ষা অনুযায়ী উযূ করে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তবে তার মূল্য আল্লাহ্‌র নিকট এতটুকু যে, সে অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে।

١٠- عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدِ الْجُهَنِّىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لاَ يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- رواه أحمد

১০. হযরত যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নির্ভুলভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে আল্লাহ্ তার পূর্ববর্তী পাশারাশি (সগীরা গুনাহসমূহ) ক্ষমা করে দিবেন। (আহ্‌মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যাই এ হাদীসের ব্যাখ্যা।

হতভাগ্যদের জন্য আফসোস

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক সালাতের প্রতি এত অনুপ্রেরণা ও ভয় প্রদর্শনমূলক অসংখ্য বাণী প্রদানের পরও যারা সালাত সম্পর্কে উদাসীন ও বেপরোয়া তারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগহ থেকে বঞ্চিত এবং তারা তাদের আখিরাতকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

"আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুল্‌ম করেন নি বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৭)

সালাত সর্বাধিক প্রিয় আমল

١١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - رواه البخارى

১১. হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন্ কাজ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয়, সে বিষয় আমি নবী কারীম ﷺ এর কাছে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন ঃ যথাসময়ে সালাত আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ হাদীসে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও আল্লাহর্ পথে জিহাদ করাকে উত্তম কাজ বলার সাথে সাথে সালাতকে সর্বাধিক প্রিয় কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিঃসন্দেহে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এসবের মধ্যে সালাতের স্থান সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, "সালাতের হাকীকত" নামক রিসালার এই অধমের সবিস্তার বিবরণ দিয়েছে। কাজেই তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সালাতের সময়সমূহ

সালাতের যে মহান উদ্দেশ্য ও উপকারিতা রয়েছে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ তাতে যে স্বাদ অনুভব করেন তার অনিবার্য দাবি হচ্ছে, দিন রাতে সারাক্ষণ না হলেও কমপক্ষে দিন রাতের বেশিরভাগ সময় সালাতে অতিবাহিত করা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর এতদ্ব্যতীত আরো অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর তাই তিনি মানুষের উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। তবে তিনি সালাতের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে সালাতের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং বান্দার অপরাপর দায়িত্ব পালনেও ব্যাঘাত না ঘটে।

আল্লাহ্ তা'আলা ফজরের সালাত সুবহে সাদিকের পর নিদ্রাভঙ্গ শেষে এজন্য ফরয করেছেন যাতে ইবাদতের মধ্যে দিয়ে বান্দার কাজের সূচনা হয়। তারপর দুপুরের পর সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত ফরয কোন সালাত নেই, যাতে মানুষ তার নিজ নিজ দায়িত্ব এ দীর্ঘ সময়ে আঞ্জাম দিতে পারে। এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যুহরের সালাত ফরয করা হয়েছে। এ সালাত আদায়ের জন্য এমন দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়েছে যাতে প্রথম সময়ে কিংবা শেষ সময়ে সালাত আদায়

করা যায় এবং এ দীর্ঘ সময়েও যেন কারো অসচেতনা দেখা না যায়। বিকেলের লক্ষণ শুরু হওয়ার সময় আসরের সালাত ফরয করা হয়েছে যাতে এই নির্দিষ্ট সময়ে অধিকাংশে লোক নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের পর আনন্দ স্ফূর্তি করে কাটায় তখন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ সালাতে মশগুল হয়ে যায়। এরপর দিনের অবসানের পর মাগরিবের সালাত ফরয করা হয়েছে যাতে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্-তাহ্‌লীলের মধ্য দিয়ে রাতের সূচনা হয়। তারপর নিদ্রা যাবার পূর্বে ইশার সালাত ফরয করা হয়েছে যাতে দিনের সূচনা যেমন সালাত দ্বারা হয়েছে ঠিক যেরূপ নিদ্রার পূর্বে মুহূর্তেও যেন সালাতের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। আর এর দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমাদের সুবিধার্থে এসব সালাতের মধ্যে ব্যাপক সময় দান করা হয়েছে যাতে আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী আমরা প্রথম, মধ্য কিংবা শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করতে পারি।

এই বিশ্লেষণের উপর যদি কোন লোক গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে তার সামনে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, যুহর থেকে ইশা পর্যন্ত সালাতসমূহের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা অল্প সময়ের হলেও একজন সত্যনিষ্ঠ মু'মিনের কাছে সালাত যে অমূল্য সম্পদ এবং যে স্বাদের বস্তু তার পক্ষে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়াই সাধারণ অবস্থার দাবি এবং এর দ্বারা যেন আল্লাহ্ এবং তাঁরই বান্দার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে যায়। ফজর থেকে যুহরের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান এজন্য রাখা হয়েছে । যাতে মানুষ এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার অপরাপর কর্তব্য কর্ম আঞ্জাম দিতে পারে। তবে যারা ভাগ্যবান তারা এই দীর্ঘ সময়ের ফাঁকে চাশ্‌তের সালাত আদায় করে থাকে। একইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইশার সালাত থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত কোন সালাত ফরয করেন নি যাতে মানুষের সহজাত দাবি অনুযায়ী আরাম করতে পারে। এ সময়ের মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান রাখা হয়েছে। তবে এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সালাতের অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। মুকীম-মুসাফির সর্বাবস্থায় নিজেও তা পালন করতেন। চাশ্‌ত ও তাহাজ্জুদের সালাত সম্পর্কিত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুপ্রেরণামূলক যে বাণী প্রদান করেছেন সে বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। নিম্নোক্ত আলোচনা কেবল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ পর্যায়ের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ وَقْتُ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مَالَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الاَوَّلُ وَوَقْتُ الصَّلٰوةِ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَالَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطُ قَرْنُهَا الاَوَّلُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ -

رواه البخارى ومسلم واللفظ المسلم

১২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, সূর্যের উপরের অংশ উদিত না হওয়া পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময় রয়েছে। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে আসরের সালাতের সময় না হওয়া পর্যন্ত যুহরে সালাতের সময় রয়েছে। সূর্যের আলোকরশ্মি হলুদ বর্ণ ধারণা না করা পর্যন্ত এবং তার নিম্নাংশ অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত আসরের সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকে। মাগরিবের সালাতের সময় সূর্যাস্ত থেকে শাফাক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত এবং ইশার সালাতের সময় অর্ধরাত পর্যন্ত অবশিষ্ট (বুখারী ও শব্দমালা মুসলিমের).

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ হাদীসে জনৈক প্রশ্নকারীর জবাবে সালাতের প্রথম ও শেষ সময় বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রশ্নকারী সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কোন্ সময় পর্যন্ত আদায় করা যায় সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন এবং সালাতের শেষ সময় কি? সালাতের প্রথম সময় সম্পর্কে সম্ভবতঃ তিনি অবহিত ছিলেন।

মাগরিবের সালাত সম্পর্কে এই হাদীসে বলা হয়েছে 'শাফাক' অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময় থাকে। 'শাফাক' কি এ বিষয় প্রাজ্ঞ আলিমগণ একাধিক মতামত দিয়েছেন। একথা সর্বজনবিদিত যে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে লাল আভা ভেসে উঠে।[১] তারপর উক্ত আভা দূর হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পর ঐগুলি সাদা হয়ে যায়[২]।

এরপর আবার উক্ত সাদা আভা অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর কালো আভা নেমে আসে। সুতরাং অধিকাংশ আলিমের অভিমত হচ্ছে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে

১. বেশির ভাগ সময় এই লাল রং প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হয়।

২. এই সাদা আভা প্রায় আধা ঘন্টা স্থায়ী হয়।

যে লাল আভা ফুটে ওঠে তাই 'শাফাক। এই অভিমত দানকারীদের মতে, পশ্চিমাকাশের লাল আভা দূরীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হয়ে যায় এবং ইশার সালাতের সূচনা ঘটে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে যে লাল আভা দেখা যায় এবং তারপর যে সাদা আভা দেখা যায় এতদুভয়কে 'শাফাক' বলা হয়। এ অভিমত অনুসারে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এর পশ্চিমাকাশে 'শাফাক' এর পর অর্থাৎ সাদা রেখা যখন অবশিষ্ট না থাকে এবং পশ্চিমকাশ কালো হয়ে যায়, তখন থেকে ইশার সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সূত্রে আরেকটি অভিমত রয়েছে যা অপরাপর ইমামগণের অনুরূপ। এই মাস'আলার ব্যাপারে তাঁর দুই প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এই অভিমত দিয়েছেন। আর এজন্যই বহু প্রবীন হানাফী ফিকহ্‌বিদ এই মতের পক্ষে ফাত্ওয়া দিয়েছেন।

এ হাদীস ও আরো কিছু সংখ্যক হাদীসে ইশার সালাতের শেষ সময় অর্ধরাত বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, ইশার সালাতের সময় সুবহি সাদিক পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, যে সকল হাদীসে ইশার সালাতের শেষ সময় অর্ধরাত বলা হয়েছে। তার মর্ম হচ্ছে, অর্ধরাত পর্যন্ত ইশার সালাতের জায়েয সময় অবশিষ্ট থাকে এবং এর পরে আদায় করা মাকরূহ্ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

١٣- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِىْ الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ اَمَرَهُ فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَصْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ - رواه المسلم

১৩. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে সালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। সে মতে তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি আমাদের সাথে (আজও কাল এই) দুই দিন সালাত আদায় কর। (প্রথম দিন) সূর্য ঢলে পড়তেই তিনি বিলাল (রা) কে আযান দিতে বললেন। তিনি আযান দিলেন। এরপর তিনি তাকে যুহরের ইকামত দিতে বললেন এবং যুহরের সালাত আদায় করা হল। আসরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি বিলাল (রা) কে নির্দেশ দিলে তিনি যথারীতি আসরের আযান ইকামত দেন। উল্লেখ্য, তখন সূর্য উপরে অবস্থিত শুভ্র ও স্বচ্ছ ছিল। তারপর সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি তাকে মাগরিবের ইকামত দিতে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন। তারপর তিনি শাফাক অদৃশ্য হওয়া মাত্র তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ইশার ইকামত দেন। তারপর রাত শেষে সুবহি সাদিক হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ফজরের ইকামত দেন ও সালাত আদায় করেন।

তারপর দ্বিতীয় দিন এলে তিনি তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পরপর যুহরের আযান দানের জন্য বিলালকে নির্দেশ দেন। তিনি তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করেন এবং তাপ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়ার পর যুহরের (শেষ ওয়াক্ত) সালাত আদায় করেন। তারপর আসরের সালাত আদায় করেন। তবে সূর্য তখনো উপরে ছিল। কিন্তু প্রথম দিনের অপেক্ষা অধিক বিলম্বে। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করেন, তবে তখন 'শাফাক' অদৃষ্ট হয় নি। এরপর রাতের এক তৃতীয়াংশের পর ইশার সালাত আদায় করেন। তারপর সুবহি সাদিকের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি বললেন, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ এই দুইদিন যা দেখলে তা-ই হচ্ছে তোমাদের সালাতের সময়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সালাতের প্রথম ও শেষ সময় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেবল নিজ যবানীতে বুঝিয়ে দেয়ার চাইতে আমল করে দেখানো উত্তম মনে করেছেন। আর তাই তিনি প্রশ্নকারীকে তাঁর সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি প্রথম দিন প্রথম ওয়াক্তে এবং দ্বিতীয় দিন জায়িয ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করে সালাত আদায় করেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি আমাদেরকে যে সময় সালাত আদায় করতে দেখেছ তা-ই হচ্ছে সালাতের প্রথম ও শেষ সময়।

١٤- عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلَى اَبِىْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِىِّ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ

فَقَالَ كَانَ يُصَلِّىْ الْهَجِيْرَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الأولَى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّىْ الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلَى رَحْلِهِ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ فُقَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمَأَةِ - رواه البخارى

১৪. সায়্যার ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি ও আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবী আবূ বারযা আসলামী (রা)-এর নিকট গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে (কোন সময়) ফরয সালাত আদায় করতেন সে বিষয়ে আমার পিতা তাঁর নিকট জানতে চাইলেন। তিনি বললেন ঃ যুহরের সালাত যাকে তোমরা প্রথম সালাত (যুহর) বল, সূর্য ঢলো পড়ার পর তিনি তা আদায় করতেন। আসরের সালাত তিনি এমন সময় পড়তেন যে সালাতের পর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়ীতে ফিরে যেত অথচ সূর্য তখনো পরিষ্কার থাকত। বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিবের সালাত সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন তা আমি ভুলে গেছি। বর্ণনকারী সাহাবী বলেন, ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বল তা তিনি দেরী করে আদায় করতে পসন্দ করতেন এবং এ সালাত আদায়ের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া কিংবা পরে কথা বলা অপসন্দ করতেন। ফজরের সালাত তিনি এমন সময় শেষ করতেন যখন কেউ তার কাছে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারত এবং ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশ' আয়াত পাঠ করতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আবূ বারযা আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাগরিবের সালাতের সময় সম্পর্কে বলেছেন তা আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত সায়্যার ইব্ন সালমা (রা) বলতে ভুলে গেছেন। অন্য হাদীস সূত্রে জানা যায় যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যাস্তের পর প্রথম ওয়াক্তেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তবে কখনো কখনো বিশেষ কোন অবস্থা হলে বিলম্বে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।

١٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّىْ الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ

وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ - رواه البخارى ومسلم

১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইবনুল হাসান ইব্ন আলী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট নবী কারীম ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত কখন আদায় করতেন। তিনি বললেন ঃ নবী কারীম ﷺ যুহরের সালাত সূর্য ঢলে পড়লে আদায় করতেন আর সূর্য দীপ্তিমান থাকার সময় (শীত গ্রীষ্মে কোন পার্থক্য হত না) আসরের সালাত আদায় করতেন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরই মাগরিবের সালাত এবং লোক বেশি হলে তাড়াতাড়ি আর কম হলে বিলম্বে ইশার সালাত আদায় করতেন। ফজরের সালাত অন্ধকারেই আদায় করে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে হযরত জাবির (রা) এবং ইতোপূর্বে হযরত আবূ বারযা আসলামী (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে যুহরের সালাত সম্পর্কে নবী করীম ﷺ এর সাধারণ আমল জানা গেল। আর তা হল এই যে, তিনি দ্বিপ্রহরের পর পরই যুহরের সালাত আদায় করতেন। তবে পরবর্তী হাদীস থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠবে যে নবী করীম ﷺ এর এ অভ্যাস গ্রীষ্ম ব্যতীত অপরাপর ঋতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কারণ যখনই প্রচণ্ড গরম পড়ত তখনই তিনি গরমে ভাটা পড়লে যুহরের সালাত আদায় করে নিতেন এবং উম্মাতকেও সেই দিক নির্দেশনা দিতেন।

١٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ - رواه النسائى

১৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গ্রীষ্ম ঋতুতে ঠাণ্ডার সময় এবং শীত মওসুমে তাড়াতাড়ি ওয়াক্ত শুরু হতেই সালাত আদায় করতেন। (নাসায়ী)

١٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - رواه البخارى

১৭. হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সূর্যের তাপ প্রখর হলে তোমরা যুহরের সালাতকে বিলম্বে (প্রখরতা-প্রশমিত হওয়ার পর) আদায় করবে। কেননা তাপের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ায় আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি তার মধ্যে যেগুলোর বাহ্যিকরূপ রয়েছে তা আমরা জানি ও বুঝি। আর কিছু আছে আভ্যন্তরীণ যা আমাদের অনুভবের উর্ধ্বে।

নবী-রাসূলগণ কখনো কখনো ঐ সব বস্তুর প্রতি ইংগিত করেন। যেমন, আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ গরমের মওসূমের তাপের প্রখরতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে উদ্ভূত। গরমের প্রখরতার বাহ্যিক কারণ সূর্য, একথা সর্বজনবিদিত এবং তা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু বাতিনী ও অদৃশ্য জগতে জাহান্নামের আগুনের সাথে রয়েছে এর নিবিড় সম্পর্ক। আর এ হচ্ছে ঐ বস্তুরই হাকীকত যা নবী রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে, সর্বাধিক সুখ-শান্তির মূলে রয়েছে জান্নাত এবং সর্ববিধ কষ্ট ও দুঃখের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জাহান্নাম। দুনিয়ায় যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ কষ্ট রয়েছে তা আখিরাতের সীমাহীন সুখ-দুঃখের তুলনায় বিশাল সমুদ্রের অথৈ জলরাশির এক বিন্দুর সাথে তুলনীয়। সুখ-দুঃখের কেন্দ্র যেমন জান্নাত-জাহান্নাম, তদ্রুপ এক বিন্দু পানির উৎস ও সমুদ্র। এই হাদীসের আলোকে তাই বলা যায় যে, গ্রীষ্ম ঋতুর প্রখরতা জাহান্নামের প্রবল তাপের সাথেই সম্পৃক্ত। মোদ্দাকথা, গরমের প্রখরতা ও দাবদাহ জাহান্নামের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং তা আল্লাহ্‌র ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। আর শীতলতা ও শৈত্য আল্লাহ্‌র অসীম রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ। এজন্যই যে মওসূমের দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের স্থলভাগ জাহান্নামের রূপ, ধারণ করে সে মওসূমে খানিকটা বিলম্বে খরতাপ কমে ঠাণ্ডা হলেই যুহরের সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

١٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ فَيَأْتِى الْعَوَالِىَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ - رواه البخارى ومسلم

১৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আসরের সালাত আদায় করতেন তখন সূর্য উর্ধ্বাকাশে দীপ্তিমান থাকত। তারপর কেউ উপকণ্ঠের (মদীনার উঁচু অঞ্চল) দিকে গেলে সূর্য তখনো উর্ধ্বাকাশেই থাকত । (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আনাস (রা) দীর্ঘজীবি ছিলেন। তিনি হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের অবসানের পর উমায়্যা খিলাফতের প্রায় পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় বনূ

উমায়্যার অনেক শাসক আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করত। হযরত আনাস (রা) এ কাজকে ভুল এবং সুন্নাত পরিপন্থী মনে করতেন এবং সময়-সুযোগমত তিনি এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করতেন। এই হাদীস বর্ণনার মূলে তাঁর এ উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত বিলম্বে কখনো আসরের সালাত আদায় করতেন না। তিনি যখন আসরের সালাত আদয় করতেন তখন সূর্য উর্ধ্বাকাশে দীপ্তি ও অপরিবর্তিত থাকত। এমনকি তাঁর সাথে সালাত আদায় করে যদি কেউ মদীনার উপকণ্ঠে যেত তখনো সূর্য উর্ধ্বাকাশে দীপ্তিমানই প্রতিভাত হতো। 'আওয়ালী' মদীনার নিকটবর্তী উপকণ্ঠকে বলা হয়। এটি মদীনা থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত। এসবের মধ্যে যেটি অদূরে সেটির ব্যবধান দুই মাইল আর যা দূরে তার দূরত্ব পাঁচ থেকে ছয় মাইল।

١٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا - رواه مسلم

১৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বসে বসে কেউ কেউ সূর্যের আলো হলদে বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, এমনকি সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝামাঝি এলে সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর দেয়। এতে সে আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে। আর এটাই হল মুনাফিকের সালাত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিশেষ কোন উযর ব্যতীত আসরের সালাত এতটুকু বিলম্বে আদায় করা যাতে সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং মুসল্লী মোরগের ঠোঁট দ্বারা আহার করার ন্যায় তাড়াতাড়ি করে চার রাকা'আত সালাত আদায় করে, যাতে নামমাত্র আল্লাহ্‌র যিক্‌র থাকে-এ হল মুনাফিকের সালাত। মু'মিন ব্যক্তির সকল সালাত বিশেষত আসরের সালাত হাদীসে তাড়াতাড়ি রুকু-সিজ্‌দা করাকে মোরগের ঠোঁটের ঠোকরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সম্ভবত এর চেয়ে চমৎকার উপমা-উৎপেক্ষা আর হতে পারে না।

শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি কোন কোন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। আমরা যেমন শয়তানের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ, তদ্রুপ শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে সূর্য উদয়-অস্তমিত হওয়ার বিষয়টির হাকীকত সম্পর্কেও অনবহিত। তবে কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেন, এটাও একটি চমৎকার উপমা।

মাগরিবের সময় প্রসঙ্গে

٢٠- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَالَمْ يُؤَخِّرُوْا الْمَغْرِبَ اِلَى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ - رواه أبوداؤد

২০. হযরত আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাত সর্বদা কল্যাণের উপর থাকবে, অথবা তিনি বলেছেন, সৃষ্ট প্রকৃতির উপর থাকবে, যতক্ষণ তারা নক্ষত্ররাজি ঘনভাবে দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব না করে মাগরিবের সালাত আদায় করবে। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের সালাত সাধারণত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন। এ হাদীস দ্বারা একথাই জানা যায়। যে উযর ব্যতীত তারকারাজি সমগ্র আকাশে দৃষ্টিগোচর হওয়া অবদি বিলম্বে মাগরিবের সালাত আদায় করা অপসন্দনীয় কাজও মাকরূহ। তবে 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত এই সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকে যেমন ইতোপূর্বে এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনো যদি কোন দীনি কাজের চাপে মাগরিবের সালাত আদায় বিলম্ব হয় তখনই কেবল এহেন বিলম্বের অবকাশ থাকতে পারে। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাফীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আসরের সালাতের পর ওয়ায নসীহত শুরু করেন এমনকি সূর্য ডুবে সারা আকাশ জুড়ে তারকারাজি দীপ্তিমান হয়ে ওঠে আর তিনি তার ওয়ায অব্যাহত রাখেন। উপস্থিত জনতার কেউ কেউ আস্সালাত আস্সালাত বলতে থাকেন। এতদশ্রবণে তিনি ভীষণভাবে ধমক দেন এবং বলেন, এহেন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মাগরিবের সালাত বিলম্বে আদায় করতেন। তাই এমন অবস্থায় দেরী করা যায়।

ইশার সময় প্রসঙ্গে

٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُوْا الْعِشَاءَ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ - رواه أحمدوالترمذى وابن ماجه

২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতকে কষ্টে ফেলব একথা যদি মনে না করতাম, তবে আমি তাদেরকে ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধ রাত পর্যন্ত দেরী করে আদায়ের নির্দেশ দিতাম। (আহ্মাদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্)

٢٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ الاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلاَ نَدْرِىْ اَشَىْءٌ شَغَلَهُ فِىْ اَهْلِهِ اَوْ غَيْرَ ذَالِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ تَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلاَ اَنْ يَّثْقُلَ عَلَى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَلَّى - رواه مسلم

২২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে ইশার সালাত আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। রাতের এক তৃতীয়াংশে অথবা আরো কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। আমরা জানতাম না যে, জরুরী কোন কাজ তাঁকে তাঁর ঘরে ব্যস্ত রেখেছিলেন, না অন্য কোন কাজে তিনি মশগুল ছিলেন। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে (আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন ঃ তোমরা এমন এক সালাতের জন্য অপেক্ষা করছ, যার জন্য তোমরা ব্যতীত অন্য কোন ধর্মাবলম্বীগণ অপেক্ষা করে নি। আমার উম্মাতের উপর যদি তা কষ্টকর না হতো, তাহলে তাদের নিয়ে (সব সময়) এই সময়ই সালাত আদায় করতাম। তারপর তিনি মুআ'য্যিনকে আদেশ দিলেন। সে সালাতের ইকামত দিল এবং তিনি সালাত আদায় করলেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'টি হাদীস থেকে একথা পরিষ্কার জানা গেল যে, ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশের পর আদায় করা উত্তম। কিন্তু সাধারণ মুসল্লীদের এতক্ষণ জেগে থেকে সালাত আদায় করা সত্যি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ কষ্টের দিকে লক্ষ্য করেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উম্মাতের সুবিধার্থে তাড়াতাড়ি করে সালাত আদায় করে নিতেন। হযরত জাবির (রা) সূত্রে এ মর্মে একটি হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইশার সালাতে যদি তাড়াতাড়ি লোক সমাগম হতো তাহলে তাড়াতাড়ি, আর বিলম্বে লোক সমাগম হলে বিলম্বে নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করে নিতেন। নবী করীম ﷺ এর কথা ও কাজ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি জানা যায় যে, কোন সামষ্টিক আমল সম্পাদন করতে যেয়ে উত্তম সময় পেতে যদি সাধারণ মানুষের কষ্ট হয়, তবে তা বর্জন করাই উত্তম। আল্লাহ্ চাহেত সাধারণ মানুষের কষ্ট বিবেচনা করে উত্তম সময় বর্জন করায় হয়ত বা আরো অধিক সাওয়াব হবে। অন্যকথায় বলা যায়, সামষ্টিক কাজে সময়ের মর্যাদার তুলনায় সাধারণের অবস্থায় দিকে লক্ষ্য রাখা সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে

অগ্রগামী হওয়ার দাবি রাখে। এ হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, ইশার সালাত কেবল এই উম্মাতের উপরই ফরয। অন্য কোন উম্মাতের উপর এই সালাত ফরয ছিল না। এই কথা অন্য হাদীসে আরো সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে।

٢٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ -- رواه أبوداؤد والدارمى

২৩. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের এই শেষ ইশার সালাত সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত আছি। তৃতীয় রাতের চাঁদ অস্তমিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সালাত আদায় করতেন। (আবূ দাউদ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ অভিজ্ঞতার নিরিখে ও হিসাব করে দেখা গেছে যে, তৃতীয় রাতের চাঁদ সাধারণত দুই-আড়াই ঘন্টা পর অস্তমিত হয়। এই হাদীস সূত্রে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাধারণত এই সময়ে ইশার সালাত আদায় করতেন।

ফজরের সময় প্রসঙ্গ

٢٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ فِى الْغَلَسِ - رواه البخارى ومسلم

২৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে চলে যেত, কিন্তু অন্ধকারে তাদের চেনা যেত না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন এরূপ অন্ধকার থাকত যে, মহিলারা মসজিদ থেকে চাদর গায়ে জড়িয়ে ঘরে ফিরত কিন্তু কেউ তাদের চিনতে পারত না।

٢٥- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَزَيْدَبْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّافَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لِاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَ دُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً - رواه البخارى

২৫. কাতাদা সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একরাতে নবী করীম ﷺ ও যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) এক সাথে সাহরী খান। তাঁরা সাহরী খাওয়া শেষ করার পর নবী করীম ﷺ সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সালাত আদায় করেন। আমরা আনাসের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সাহরী খাওয়া শেষ করার এবং সালাতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি পরিমাণ সময় ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, কেউ পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করতে পারে এই পরিমাণ সময়। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। এই হিসেবে ঐদিন সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুবহি সাদিকের সাথে সাথে ফজরের সালাত আদায় করেছিলেন। তবে তার সাধারণ অভ্যাস ছিল এরূপ, তিনি তাড়াতাড়ি (অন্ধকারে) ফজরের সালাত আদায় করে নিতেন, যেমন উপরে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস সূত্রে জানা যায়। কিন্তু সুবহি সাদিক হতেই ফজরের সালাত আদায় করা তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল না। একথা আবূ বারযা আসলামী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ও অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায়। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত ঘটনার ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, সম্ভবত বিশেষ কোন কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেদিন প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করেন, যেমনিভাবে আমরা কোন বিশেষ অবস্থায় সালাত আদায় করে থাকি। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٢٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ - رواه أبوداؤد، جامع ترمذى ، دارمى

২৬. হযরত রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ফর্সার সময় (সুবহি সাদিকের ছড়িয়ে পড়লে) ফজরের সালাত আদায় করবে। কেননা এতে অধিক সাওয়াব রয়েছে (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত হযরত আয়েশার হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত এমন অন্ধকারে আদায় করতেন যে, চাদর পরিহিত মহিলারা সালাত শেষে বাড়ি ফেরার পথে তাদের চেনা যেত না।

পক্ষান্তরে হযরত রাফি' ইব্ন খাদীজা (রা) বর্ণিত হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, ফজরের আলো দীপ্তিমান হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায়ে রয়েছে অতিরিক্ত সাওয়াব। প্রাজ্ঞ আলিমগণ এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। এই অধম (গ্রন্থকার) এর মতে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) বর্ণিত হাদীস মুতাবিক ফর্সার আলোতে ফজরের সালাত

আদায় করা উত্তম। অর্থাৎ এতটুকু বিলম্ব করা চাই যাতে সুবহি সাদিকের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় বেশির ভাগ লোক তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং ফজরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন, যেমন বর্তমানেও কিছু সংখ্যক মুত্তাকী লোক এরূপ করে থাকেন। তাঁদের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায়ে বিলম্ব করতেন না। কারণ সুবহি সাদিকের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর আদায় করা হলে তাদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষাজনিত কষ্ট করতে হতো। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেশির ভাগ সময় অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করে নিতেন। যেমন, ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশে আদায় করা উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুসল্লীদের সুবিধার্থে তাড়াতাড়ি আদায় করে নিতেন। ঠিক একইভাবে লোকদের সুবিধার্থে তিনি অন্ধকারেই ফজরের সালাত আদায় করে নিতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বক্তব্যও পেশ করেন যে, লোকদের সুবিধার প্রতি দৃষ্টিদান সময়ের ফযীলতের চেয়ে অধিক মর্যাদার দাবি রাখে।

আমাদের এই বর্তমান যুগে যেহেতু তাহাজ্জুদগুযার ও ফজরের প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়কারী লোকের সংখ্যা কম, তাই সবার সুবিধার্থে সুবহি সাদিকের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পরই ফজরের সালাত আদায় করা উত্তম। কারণ অন্ধকার থাকতেই যদি প্রথম ওয়াক্তে জামা'আতে অংশ নেবে। এ সকল কারণে আমাদের বর্তমান সময়ে কিছু বিলম্ব ফর্সার সময় ফজরের সালাত আদায় করাই উত্তম হবে। তবে হ্যাঁ, কোন এলাকার মুসল্লীরা যদি প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদয়ের জন্য একত্র হয় এবং বিলম্ব করা তাদের জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়, তবে তাদের অন্ধকারে আদায় করা উত্তম হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাধারণ আমল ছিল। একারণেই বহু এলাকা রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপরিউক্ত আমলের উপর ভিত্তি করে অন্ধকারের মধ্যে ফজরের সালাত আদায় করা হয়।

শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় প্রসঙ্গ

٢٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً لِوَقْتِهَا الاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى -- رواه الترمذى

২৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর পর দু'বার কোন সালাত শেষ ওয়াক্তে আদায় করেন নি। এমনকি এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) আলোচ্য হাদীসে দু'বারের শর্ত এজন্য জুড়ে দেন যে, একবার এক ব্যক্তিকে সকল সালাতের প্রথম ও শেষ সময় নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করে দেখিয়েছিলেন। এ ঘটনা সহীহ্ মুসলিমের সূত্রে ১৩ ক্রমিকে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা হযরত আয়েশার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে বিলম্বে সালাত আদায় করা নবী কারীম ﷺ এর অভ্যাস ছিল না।

٢٨- عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِىُّ ثَلٰثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَلاَ اَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا - رواه الترمذى

২৮. হযরত আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ হে আলী! তিনটি বিষয় বিলম্ব করো না। সালাত যখন তার সময় হয়, জানাযা যখন তা উপস্থিত করা হয় এবং স্বামীবিহীন নারী যখন তুমি উপযুক্ত পাত্র (কুফ্) পাও। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত তিনটি কাজ সর্বদা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা উচিত। কোন স্বামীবিহীন মহিলার যদি সমতাসম্পন্ন পাত্র পাওয়া যায়, তবে বিয়ে সম্পাদন করতে বিলম্ব না করা চাই। অনুরূপভাবে কারো জানাযা উপস্থিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দাফন কাফন করা চাই এবং বিলম্ব করা উচিত নয়। অনুরূপ সালাতের (আদায়ের) সময় হলেই তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা উচিত।

٢٩- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْيُؤَخِّرُوْنَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ؟ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ - رواه مسلم

২৯. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমার উপর এমন ভ্রান্ত শাসক হবে যারা সালাতকে মিশ্রণ করে (বিনয়ভাব ও নিষ্ঠা ছাড়াই) সালাত আদায় করবে, অথবা বলেছেন, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করবে তখন তুমি কি করবে? (আবূ যার (রা) বলেন) আমি বললাম, এমন অবস্থায় আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি যথাসময় সালাত আদায় করে নিবে।

তারপর তাদের সাথেও যদি সালাত পাও, তবে তুমি আবার সালাত আদায় করে নেবে এবং এ সালাত হবে তোমার জন্য নফল। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বানূ উমায়্যার কোন কোন শাসকের আমলে সালাত আদায়ে এমন গড়িমসি লক্ষ্য করা যেত। হযরত আনাস (রা) সহ যে সকল সাহাবা ও অধিকাংশ প্রবীন তাবিঈ বনূ উমায়্যার যুগে বেঁচে ছিলেন, তাঁরা এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর এই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করতেন।

নিদ্রা কিংবা ভুলের কারণে সালাত কাযা হলে করণীয়

٣٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً اَوْنَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا اَنْ يُّصَلِّيْهَا اِذَا ذَكَرَهَا -رواه البخارى مسلم

৩০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের কথা ভুলে যায় অথবা সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে যায় সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নেয়, কেননা এই হচ্ছে তার কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি (ওয়াক্ত যাওয়ার পর) ঘুম থেকে উঠে কিংবা সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সে যেন সালাত আদায় করে নেয়। এমতাবস্থায় তার সালাত আদায় হিসেবে গণ্য হবে-কাযার গুনাহ হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কোন কোন সফরে এমন ঘটনা সংঘটিত হয়। গভীর রাতে তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ পথ চলতেন। এরই মাঝে একটু অবসাদ কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে আরাম করতে যেয়ে শুয়ে পড়েন এবং হযরত বিলাল (রা) জেগে থাকার ও সবাইকে ফজরের জন্য ঘুম থেকে ওঠানোর দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ্রই অসমী কুদরত, সুবহি সাদিকের সময় স্বয়ং হযরত বিলাল (রা) ঘুমিয়ে পড়েন এমনকি সূর্য ওঠে যায়। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চোখ খোলেন। তারপর সবাই ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেন। সবার সালাত কাযা হওয়ার প্রত্যেকেই বিষণ্ন হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযান দানের ব্যবস্থা করে সালাতের ইমামতি করেন এবং বলেন, নিদ্রাজনিত কারণে সালাতের সময় গড়িয়ে গেলে তাতে গুনাহ নেই। বরং জাগ্রত থেকে যদি কেউ সালাত কাযা করে, তবে তার জন্য রয়েছে গুনাহ। (মুসলিমের সংক্ষিপ্ত সার)

আযান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পবিত্র মক্কা থেকে মদীনা তাইয়্যেবা হিজরত করেন তখন জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে নির্মাণ করেন। জামা'আতের সময় হলে কিভাবে সহজে লোকদের জড়ো করা যায় এ বিষয়টি তাঁকে ভাবিয়ে তুলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বিষয়ে সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করেন। এ পর্যায়ে কেউ কেউ বললেন, সালাতের জামা'আত শুরু করার প্রারম্ভে প্রতীক হিসেবে একটি দীর্ঘ পতাকা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কেউ কেউ বললেন, কোন উঁচু জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন ইয়াহূদীরা তাদের ইবাদতখানার যেমন শিঙা বাজায় সেরূপ আমরা শিঙা বাজিয়ে লোকদের জামা'আতে শরীর করতে পারি। কেউ কেউ খ্রিস্টানদের ঘন্টা বাজানোর অভিমত দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসব অভিমত কোনটিকেই সন্তুষ্ট হলেন না। তারপর তিনি এ বিষয় চিন্তা-বিভোর থাকেন। তাঁর এ চিন্তিতভাবে সাহাবাদের ভাবিয়ে তুলে। তাঁদের মধ্যকার এক আনসার সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আব্দ রাবিবহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে চিন্তিত দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। সে রাতেই তিনি স্বপ্নযোগে আযান ও ইকামতের শব্দমালা লাভ করেন। (যার সবিস্তার বিবরণ পরবর্তী হাদীস থেকে জানা যাবে)। তিনি অতি প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে স্বপ্নের বিষয় তাঁকে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ চাহেত তোমার স্বপ্ন যথার্থ এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়েছে। (একথার সত্যতা তিনি এজন্য মেনে নেন যে, সাহাবীর স্বপ্ন সংঘটিত বিষয় অবহিত হওয়ার পূর্বেই তিনি ওহী যোগে শব্দমালা অবহিত হয়েছিলেন, অথবা স্বপ্ন বৃত্তান্ত শোনার পর আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি করেন।) মোটকথা তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আব্দ রাব্বিহকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন হযরত বিলাল (রা) কে আযান ও ইকামতের শব্দমালা শিক্ষা দেন। উল্লেখ্য হযরত বিল্লাল (রা) উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য আযান দিতেন। এদিন থেকেই আযানের শুভ সূচনা ঘটে। আজ পর্যন্ত তা ইসলামের বিশেষ প্রতীকরূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এই ভূমিকা পাঠের পর আযান ও ইকামত সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

ইসলামে আযানের শুভ সূচনা

٣١- عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِبْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِىُّ ﷺ لِلصَّلٰوةِ كَيْفَ يُجْمَعُ النَّاسُ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ

حُضُوْرِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا رَأَوْهَا اٰذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ قَالَ
وَذُكِرَلَهُ الْقِنَعُ يَعْنِى شَبُّوْرَ الْيَهُوْدِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ وَهُوَ مِنْ اَمْرِ
الْيَهُوْدِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ النَّصَارٰى فَانْصَرَفَ
عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُرِىَ الْاَذَانَ فِىْ
مَنَامِهِ قَالَ فَغَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ
لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ اِذْ اَتَانِىْ اٰتٍ فَاَرَانِىَ الْاَذَانَ ...... فَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ قَالَ
فَاَذَّنَ بِلَالٌ – رواه أبوداؤد

৩১. হযরত আনাস তনয় আবূ উমায়র সূত্রে তাঁর আনসার চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জামা'আতে সালাত আদায় কল্পে কিভাবে লোক জমা করা যায় যে বিষয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেউ কেউ বললেন সালাতের সময় পতাকা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। লোকেরা যখন তা দেখবে তখন অন্যদের সালাতের জামা'আতের কথা জানাবে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিমত পসন্দ করলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর কাছে ইয়াহূদীদের শিঙার (বিউগল) প্রস্তাব দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন, এ হচ্ছে ইয়াহূদীদের ব্যবহৃত একটি বস্তু। বর্ণনাকারী বলেন তারপর তাঁর নিকট খ্রিস্টানদের ঘন্টার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি বললেন, এতে খিস্টানদের ব্যবহৃত বস্তু (মোটকথা সে মজলিসে কোন সিদ্ধান্ত হল না)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভীষণ চিন্তিত দেখে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) ভীষণ চিন্তিত হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। তারপর স্বপ্নে তাঁকে আযানের শব্দাবলী জানানো হয়। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতি প্রত্যুষ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ সংবাদ অবহিত করে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি তখন নিদ্রা জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। ইতোমধ্যে এক আগন্তুক এসে আমাকে আযানের শব্দমালা শিখিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বিলাল! উঠো এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ কী বলে তা শিখে নাও। বর্ণন্যকারী বলেন বিলাল (রা) কার্যত নির্দেশ মান্য করেন এবং আযান দেন। (আবূ দাঊদ)

জ্ঞাতব্য ঃ আবূ দাঊদের বর্ণনায় এও আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) তাঁর স্বপ্নের বৃত্তান্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবহিত করার পূর্বেই হযরত উমর (রা) অনরূপ স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) প্রথমে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করার কারণে হযরত উমর (রা) তাঁর স্বপ্নের বিষয়টি বলতে সংকোচবোধ করেন। পরে উমর (রা) তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ বাকর (রা) সহ আরো কতিপয় সাহাবী একই স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়।

٣٢– عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ
عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ قَوْسِ يُعْمَلُ
لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِىْ وَاَنَانَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ
نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ
؛ فَقُلْتُ نَدْعُوْبِهِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ
ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ – اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهَ – اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهَ، اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ – اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ
– حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ – حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهَ –

قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّىْ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ تَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ
اللّٰهِ– حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى
الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةَ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهَ، فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَاَيْتُ
فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْشَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَارَأَيْتَ
فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَاِنَّ صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ

وَيُؤَذِّنَ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ ذَالِكَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَائَهُ وَيَقُوْلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرِىَ فَقَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -رواه أبوداؤد و الدارمى

৩২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আব্দ রাব্বিহি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (আমার পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে লোকদের একত্র করার উদ্দেশ্য ঘন্টা বানানোর নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে স্বপ্নে একব্যক্তি আমার নিকট একটি ঘন্টা হাতে নিয়ে উপস্থিত হলো। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্র বান্দা! ঘন্টাটি কি বিক্রি করবে? সে জিজ্ঞেস করল, তুমি এর দ্বারা কি করবে? আমি বললাম, আমরা এর দ্বারা লোকদেরকে সালাতের জামা'আতে ডাকব। সে বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বিষয় বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে মতে সে বলল, তুমি বল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, হায়্যা আলাস্ সালাহ্, হায়্যা আলাস সালাহ্; হায়্যা আলাল ফালাহ্, হায়্যা আলাল ফালাহ্; আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ রা) বলেন, সে আমাকে আযানের শব্দমালা বলে খানিকটা পিছু হটে গেল এবং কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, এরপর যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন এভাবে ইকামত দিবে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আক্বার, আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস্ সালাহ্, হায়্যা আলাল ফালাহ্, ক্বাদ-কামাতিস্ সালাতু ক্বাদ-কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তারপর আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট গেলাম এবং রাতে যা স্বপ্নে দেখেছি তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ চাহেত তোমার স্বপ্ন সত্য। তুমি যা স্বপ্নে দেখেছ তা বিলালকে শেখাও এবং বিলাল সেই শব্দযোগে যেন আযান দেয়। কেননা সে তোমার চেয়ে উচ্চকণ্ঠের অধিকারী। সুতরাং আমি বিলালের সাথে গেলাম এবং তাঁকে তা শেখালাম। ফলে সে আযান দিল। তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ) বলেন, উমর (রা) তাঁর ঘর থেকে আযান শুনে নিজ চাদর হেঁচড়াতে হেঁচাড়াতে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন সেই মহান সত্তার শপথ

তাকে (আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ) যেরূপ স্বপ্ন দেখান হয়েছে তদ্রুপ আমিও স্বপ্নে দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সকল প্রশংসা ও স্তুতি আল্লাহ্র জন্য। (আবূ দাঊদ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের সম্পর্কে দু'টি কথা পরিষ্কার করা আবশ্যক। যথা (১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সালাতে লোকদের জড়ো করার জন্য ঘন্টা তৈরীর নির্দেশ দিয়েছেন। (২) পক্ষান্তরে আনাস তনয় আবূ উমায়র বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে যখন ঘন্টার তৈরীর কথা বলা হয়, তখন তিনি বলেন, এতো খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বস্তু। অধমের (গ্রন্থকার) নিকট এর বিশুদ্ধ সমাধান এরূপ হতে পারে যে, সালাতে লোকদের জড়ো করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে যে সব বস্তু পেশ করা হয় তন্মধ্যে পতাকা, আগুন প্রজ্জলিতকরণ, ইয়াহূদীদের শিঙা ইত্যাদি বস্তু ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসব বিষয় সরাসরি প্রত্যাখান করেন। তারপর তাঁর অনুমোদনের জন্য দ্বিতীয় কোন বস্তু পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ঘন্টা সম্পর্কে তিনি কেবল এতটুকু বলে ক্ষান্ত করেন যে, এতো খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বস্তু। কিন্তু একথা দ্বারা ঘন্টা অবৈধ হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়নি। বরং তাঁর ভাষণ দ্বারা সম্ভবত কোন সাহাবী বুঝে নিয়েছিলেন যে, অন্যান্য বস্তুর তুলনায় তিনি একে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা এও বুঝে নিয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘন্টা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমোদন দিয়েছেন এবং যতক্ষণ এর সুষ্ঠু সমাধান বেরিয়ে না আসে ততক্ষণ এর উপর আমল করার অনুমোদন দিয়েছেন। (সম্ভবত এ কারণে কারো পক্ষ থেকে কোন বস্তু অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পেশ করা হয়নি) এ অধমের মতে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) امر بالناقوس (নবী কারীম ﷺ ঘন্টার নির্দেশ দেন) বলেছেন। কখনো কখনো কোন বস্তুর অনুমোদন ও সম্মতি দানের ক্ষেত্রে امر(নির্দেশ) শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআন-হাদীসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে দ্বিতীয় বিষয় হল এই যে, আযানে যে সব শব্দ দুই দুইবার বলা হয়েছে ইকামতে তা বলা হয়েছে একবার করে। হযরত আনাস (রা) সূত্রে পরে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, ইকামতে উক্ত শব্দসমূহ একবার করে বলারই নির্দেশ ছিল। কিন্তু অন্যান্য রিওয়ায়াত যা পরে বর্ণিত হবে। এর মধ্যে সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাও রয়েছে। আযানের মত ইকামতেও শব্দসমূহ দুই দুইবার বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীস বিশারদ নিজ প্রজ্ঞার

উপর ভিত্তি করে (ইকামতের শব্দ) এক একবার এবং অপর কিছু সংখ্যক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুই দুইবারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইকামতের ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। মতবিরোধ কেবল প্রাধান্য ফযীলাতের ক্ষেত্রে, অন্য ক্ষেত্রে নয়।

٣٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوْا اَنْ يُعْلِمُوْا وَقْتَ الصَّلٰوةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُوْنَهُ فَذَكَرُوْا اَنْ يُوْرُوْا نَارًا اَوْ يَضْرِبُوْا نَاقُوْسًا فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ - رواه البخارى ومسلم واللفظ له

৩৩. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালাত আদায়ের লক্ষ্যে আগত মুসল্লী সংখ্যা যখন বেড়ে যায়, তখন সাহাবা কিরাম পরিচিত জিনিসের মাধ্যমে সালাতের সময় জানিয়ে দেওয়ার বিষয় আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে তারা আগুন জ্বালানো অথবা ঘন্টা বাজানোর কথা উল্লেখ করেন। তারপর বিলাল (রা) কে আযানের শব্দমালা দু'বার করে এবং ইকামতের শব্দমালা একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা মুসলিমের)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা)-এর স্বপ্ন ও অপরাপর ঘটনাও বর্ণিত হয়নি। ঘটনা বর্ণনাকারী এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতে কোন আপত্তি আছে বলে মনে করছেন না। এ ধারণায় যে, আমাদের শ্রোতা সাধারণ হয়ত এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে অবহিত আছেন অথবা অন্য কোন কারণে পুরো ঘটনা বর্ণনা করা সংগত মনে করছেন না।

যেমন উপরে বর্ণিত হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে ইকামতের শব্দ একবার করে উল্লিখিত হয়েছে। তবে যে সকল সুধি ইকামতের শব্দ দু'বার করে বলেন, তাঁরা এই দুই হাদীস সম্পর্কে বলেন যে, এ হল আযানের সূচনাকালের প্রারম্ভিক ঘটনা। দীর্ঘদিন এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। সাত-আট বছর পর হুনায়ন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মাহযূরাকে যে আযান ও ইকামতের তালকীন (প্রশিক্ষণ) দেন তাতে আযান ও ইকামতের শব্দমালা দু'বার করে ছিল, যা পরবর্তী দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হবে। এ জন্যই পরবর্তী হুকুমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অধম (গ্রন্থকার) হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর সর্বশেষ ফয়সালা পেশ করতে আগ্রহী। তাহল আযান ও ইকামতের শব্দমালার ব্যাপারে যে মতপার্থক্য তা মূলত কুরআন মজীদের বিভিন্ন কিরা'আতের মতপার্থক্যের মত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে পদ্ধতিই বর্ণিত হোক নিঃসন্দেহে তা বিশুদ্ধও প্রতিষ্ঠিত।[১]

আবূ মাহযূরা (রা) কে আযান শিক্ষাদান

٣٤- عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَلْقى عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ- اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ ثُمَّ تَعُوْدُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًارَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ- رواه مسلم

৩৪. হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমাকে আযান শিক্ষা দেন এবং বলেনঃ তুমি বল আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশাহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লালাহ্, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লালাহ্; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ তারঃপর তুমি পুনরায় বলঃ আশাহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা-ইলাহা আল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলূল্লাহ্, হায়্যা আলাস্ সালাহ্, হায়্যা আলাস্ সালাহ্, হায়্যা আলাল ফালাহ্, হায়্যা আলাল ফালাহ্; আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লালাহ্ (মুসলিম)।

٣٥- عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً - رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى والدارمى وابن ماجة

১. হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খ, পৃ-১৯১।

৩৫. হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উনিশ বাক্যে আযান শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন সতের বাক্যে। (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারিমীও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবূ মাহযূরা (রা) বর্ণিত এ রিওয়ায়েতে আযানের বাক্য উনিশটি বলে উল্লেখ রয়েছে। কারণ শাহাদাত সম্বলিত বাক্য অতিরিক্ত চার বার এসেছে। ইকামতে শাহাদাত সম্বলিত বাক্য অতিরিক্ত চার বার না আসায় এবং ক্বাদ কামতিস সালাহ্ দু'বার আসায় সতেরটি বাক্য হয়েছে। এই কম বেশির কারণে ইকামতের বাক্য সংখ্যা হয়েছে সতেরটি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীতে হুনায়ন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আবূ মাহযূরাকে আযান শিক্ষাদান সম্বলিত ঘটনা সংঘটিত হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে এঘটনার যে সবিস্তার বিবরণ পাওয়া যায় তা খুবই হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর এবং ঈমানের জ্যোতি বর্ধনে সহায়ক। এজন্য তা উল্লেখ করা আমি সমীচীন মনে করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেন। মক্কা বিজয় কালীন সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত একদল লোক নিয়ে হুনায়নের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। আবূ মাহযূরা (রা) তখন একজন উদ্ধত যুবক। তখনো তিনি ইসলামে দীক্ষিত হননি। তিনি তাঁর সমবয়সী নয়জন বন্ধু নিয়ে হুনায়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়ন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সালাতের সময় হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'আয্যিন আযান দেন। কিন্তু আমরা সবাই আযানকে (বরং আযান সম্বলিত দীনকেও) ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতাম । আমি আমার সাথীদের নিয়ে ঠাট্টা উপহাস ছলে আযান দিচ্ছিলাম এবং আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'আয্যিনের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে আযান দিতে শুরু করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের শব্দ শুনে আমাদের ডেকে পাঠান। আমরা তাঁর সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কার কণ্ঠ স্বর ছিল সবচাইতে উচু ? আবূ মাহযূরা (রা) বলেন, আমার সাথীরা আমার দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানিয়ে দিল। আর তাদের একথা ছিল নির্ঘাত সত্য। তিনি আমি ছাড়া সবাইকে চলে যাবার অনুমতি দেন এবং আমাকে বলেন, হে আবূ মাহযূরা! তুমি আযান দাও। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন তখন আযানের উপর ছিল আমার এমন তীব্র ঘৃণা ও অপসন্দের ভাব যা অন্য কোন বস্তুর উপর ছিল না। আল্লাহ্র পানাহ। তাঁর প্রতিও ছিল আমার তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তবে আমি তখন একান্ত নিরুপায়। তাই বাধ্য হয়ে তাঁর হুকুম তামিল করে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযানের তাল্কীন (প্রশিক্ষণ) দেন এবং বলেন ঃ তুমি বল,

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার------ থেকে শেষ পর্যন্ত (যেমনটি পূর্ববর্তী হাদীসে হযরত আবূ মহযূরা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে)। আমি যখন আযান শেষ করলাম তখন তিনি আমাকে রূপা ভর্তি একটি থলে উপহার দেন এবং তাঁর মুবারক হাত আমার মাথার সম্মুখ ভাগে রাখেন। তারপর তাঁর মুবারক হাত আমার মুখমণ্ডল ও বুকের উপর রাখেন। এরপর তিনি তাঁর মুবারক হাত নাভি পর্যন্ত মুছে এই দু'আ পাঠ করেন بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ "আল্লাহ্ তোমার মধ্যে বরকাত দান করুন এবং তোমার উপর বরকত নাযিল করুন।" তিনি তিনবার আমার জন্য এই দু'আ করেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দু'আ ও মুবারক হাতের স্পর্শে আমার অন্তর থেকে কুফ্র ও ঘৃণা চিরতরে দূর হয়ে যায় এবং তাতে ঈমান ও ভালবাসা স্থান লাভ করে। আমি তাঁর কাছে এই বলে আরয করলাম যে, আমাকে যেন মক্কা নগরীর মসজিদুল হারামের মু'আয্যিন নিয়োগ করা হয়। তিনি বললেন ঃ যাও আজ থেকে তুমি মসজিদুল হারামে আযান দিবে।

এ বিস্তারিত বিবরণ থেকে একথা খুব সহজেই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন তাঁকে দিয়ে শাহাদাতাইন (আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্) দুই দুই বারের পরিবর্তে চারচার বার বলিয়েছিলেন। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, তখনো তাঁর অন্তরে ঈমানের জ্যোতি সৃষ্টি হয়নি বরং বাধ্য হয়ে নির্দেশ পালন করেন মাত্র। তিনি তাঁর তখনকার আকীদার পরিপন্থী আযান দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য আযানের বাক্য সমূহের মধ্যে তাঁর কাছে শাহাদাতাইন ছিল সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যখন তিনি তা একবার বলে তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দ্বিতীয় বারের মত উচ্চকণ্ঠে বলার নির্দেশ দেন। অধমের ধারণা, তিনি তাঁর যবান থেকে শাহাদাতের বাক্য উচ্চারণ করানোর ব্যাপারে অটল ছিলেন এবং আল্লাহ্ যাতে উক্ত বাক্য তাঁর অন্তরে দৃঢ়মূল করে দেন, সেজন্য সর্বতোভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে তাওয়াজ্জুহ করেন। মোটকথা খুব সম্ভব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মাহযূরা (রা)-এর সে সময়কার বিশেষ মানসিক অবস্থার কারণে শাহাদাতের বাক্য, বার বার পাঠ করান। নতুবা কোন বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত দ্বারা একথা জানা যায় না যে, তিনি তাঁর মু'আয্যিন বিলাল (রা) কে শাহাদাতের বাক্য চার বার বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা)-এর বিশুদ্ধ বর্ণনায় ও কেবল দু'বার করে শাহাদাতের কথা জানা যায়। তবে এ কাথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, আবূ মাহযূরা (রা) মাসজিদুল হারামে সর্বদা এরূপ আযান দিতেন। অর্থাৎ শাহাদাতের বাক্যসমূহ চার বার করে পাঠ করতেন। হাদীস বিশারদদের

পরিভাষায় এই প্রক্রিয়াকে 'তারজী' বলে। তবে তার এ তারজী করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে যেরূপ আযানের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং যার বদৌলতে তাঁর দীন নসীব হয়েছিল সেজন্য গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তিনি 'তারজী" করতেন। অন্যথায় তিনি হযরত বিলাল (রা)-এর আযান সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। ঘটনার ধারাবাহিকতায় এও পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মুবারক হাত দ্বারা আবূ মাহযূরা (রা) সম্মুখ ভাগের যে চুলগুচ্ছ স্পর্শ করেন তা তিনি কখনো কাটতেন না, তবে এই অধমের মতে, এও যেমন তাঁর অপূর্ব প্রীতির লক্ষণ, তেমনি আযানে তারজীও ছিল অনুরূপ ব্যাপার। তাই তিনি সর্বদা তারজী সহকারে আযান দিতেন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সবিশেষ অবহিত ছিলেন। কিন্তু তথাপিও তিনি কখনো নিষেধ করেননি। তাই এ প্রক্রিয়া জায়িয হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের আবকাশ নেই। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রা) এ বিষয়ে যে সমাধান দিয়েছেন তা মূলতঃ এরূপ যে, আযান ও ইকামতের শব্দমালার পার্থক্য মূলত আল কুরআনের বিভিন্ন কিরা'আতের পার্থক্যের অনুরূপ।

আযান ও ইকামতে দীনের মৌলিক শিক্ষাও দাওয়াত নিহিত

যদিও বাহ্যত আযান ও ইকামত সালাতের সময়ে নির্দেশ করে তথাপি একথা লক্ষণীয় যে আযান ও ইকামতের হাকীকতের যে আল্লাহ্ তা'আলা আযান ও ইকামতে বিশেষ অর্থবোধক শব্দের সমাহার ঘটিয়েছেন যা মূলতঃ দীনের প্রাণ। বরং বলা চলে, তিনি দীনের পূর্ণ বুনিয়াদী শিক্ষা ও দাওয়াত এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। দীনের মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলী । এ পর্যায়ে যে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ধ্বনি দিয়ে লোকদের সালাতের দিকে আহবান করা হয় এব চাইতে উত্তম বাক্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এটাই হচ্ছে একত্ববাদের মূলকথা এবং এত রয়েছে আল্লাহ্র গুণবাচক নামের সমাহার। কোননা 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, এর মধ্যে যে প্রভাবময়ী শব্দগুচ্ছ রয়েছে, সংক্ষেপে এর চেয়ে চমৎকার শব্দগুচ্ছ নির্বাচন করা সত্যিই অসম্ভব। একথার মূলে রয়েছে এ স্বীকারোক্তি যে আল্লাহ্ আমাদের ইলাহ্ ও উপাস্য। এর সাথে সাথে এ প্রশ্ন জাগে যে, তাঁর দাসত্বের বিশুদ্ধ পদ্ধতি কিভাবে শেখা যাবে? এর উত্তরে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" এর চেয়ে উত্তম ও যুক্ত বাক্য আর হতে পারে না। এর পর 'হায়্যা আলাস সালাত'। বলে সালাতের দাওয়াত দেওয়া হয়। আর এ ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এর পর 'হায়্যা আলাল ফালাহ্' বলে মূলত এই ঘোষণাই দেওয়া হয় যে, এই ইবাদতই

মানুষ কে কল্যাণ, মুক্তি ও সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এপথ ছেড়ে অন্য পথে বিচরণ করে সে মূলত সফলতা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। মনে করা যেতে পারে যে, এযেন আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের একটি, অনন্য ঘোষণা। এ আহবান এমন শব্দ যোগে করা হয় যা কেবল বিশ্বাসের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয় বরং জীবনের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবেও গণ্য। পরিশেষে আল্লাহু আকবার; আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা এই ঘোষণাই দেওয়া হয় যে, সর্বাবিধ বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তিনি অংশীদার মুক্ত এবং শাশ্বত সত্য সত্তা। সুতরাং তাঁর সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্যও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আযান ও ইকামাতে দীনের মৌলিক বিষয়ে যে বিশেষ অর্থবোধক বাক্যসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রভাবময়ী দাওয়াত বিঘোষিত হয়েছে তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। বলাবাহুল্য আমাদের মসজিদসমূহ থেকে দৈনিক পাঁচবার এহেন দীনী দাওয়াত উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়।

কাজেই প্রত্যেক মুসলমান যদি তার শিশু সন্তানদের আযান তথা আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্' এর মর্ম সবিস্তার বুঝিয়ে দেয় তাহলে আশা করা যায় যে, তারা পারিপার্শ্বিক অনৈসলামিক দাওয়াতের শিকারে পরিণত হবে না।

আযান ও ইকামত সম্পর্কীয় কতিপয় নির্দেশ

٣٦- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرَغُ الاكِلُ مِنْ اَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُوْمُوا حَتّٰى تَرَوْنِىْ- رواه الترمذى

৩৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা) কে বললেন ঃ হে বিলাল! যখন তুমি আযন দেবে , ধীরস্থিরভাবে ও দীর্ঘস্বরে আযান দেবে এবং যখন ইকামত দেবে তাড়াতাড়ি ও অনুচ্চস্বরে ইকামত দেবে, তোমার আযান ও ইকামতের মাঝখানে এতটুকু সময় অবকাশ দেবে যাতে আহার গ্রহণকারী তার আহার থেকে, পানকারী তার পান থেকে এবং যার পায়খানা পেশাবের প্রয়োজন সে যেন তা সেরে নিতে পারে। আর তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত সালাতে দাঁড়াবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে আযান ও ইকামত সম্পর্কীয় বিষয় যে সব নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবে হাদীসের সর্বশেষ অংশ 'তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত সালাতে দাঁড়াবে না'। ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুজ্‌রা থেকে বেরিয়ে শিগ্‌গির মসজিদে তাশরীফ আনবেন এ অনুমানের বশবর্তী হয়ে সাহাবা কিরাম কখনো কখনো সালাতের জন্য দাঁড়ায়ে থাকতেন। তিনি তাঁদের এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমি যতক্ষণ মসজিদে না আসব এবং তোমরা আমাকে না দেখবে ততক্ষণ তোমরা সালাতের জন্য দাড়াবে না। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ সুস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মসজিদে তাশরীফ আনয়নের পূর্বে সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা অনর্থক কষ্টের ব্যাপার। কেননা কখনো কোন কারণে তাঁর আগমনে বিলম্বও হতে পারে। তা ছাড়া তাঁর বিনয়ী স্বভাব তাঁকে পীড়া দিত যে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ তাঁর জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

٣٧- عَنْ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ قَالَ اِنَّهُ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ - رواه ابن ماجه

৩৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (কু'বা মসজিদের) মু'আয্‌যিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা) কে তাঁর দুই আঙ্গুল দুই কানের মধ্যে ঢুকাতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, এ পদ্ধতি তোমার কণ্ঠস্বর উচ্চ করবে। (ইব্‌ন মাজাহ)

٣٨- عَنْ زِيَادِبْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىْ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُذِّنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلاَلُ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ - رواه الترمذى اَبوداؤد وابن ماجة

৩৮. হযরত যিয়াদ ইব্‌ন হারিস সুদায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ফজরের সালাতের আযান দিতে বললেন। সে মতে আমি আযান দিলাম। বিলাল (রা) একামত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সুদায়ী আযান দিয়েছে। কাজেই যে আযান দেবে, ইকামতও সেই দেবে। (তিরমিযী, আব্ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ)

٣٩- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ الْعَاصِ قَالَ اِنَّ مِنْ اٰخِرِ مَاعَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَاْخُذُ عَلَى اَذَانِهِ اَجْرًا - رواه الترمذى

৩৯. হযরত উসমান ইব্‌ন আবুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছ থেকে সর্বশেষ যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তা ছিল এই আমি এমন একজন মু'আয্‌যিন রাখব যে আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যাঁদের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও অন্তর্ভুক্ত বলেন, আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়িয নয়। অন্যান্য আলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই বাণীকে তাক্‌ওয়া ও আযীমাতের বিষয় বলে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী হানাফী আলিমগণের অনেকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় সমর্থন করেছেন। তবে আযান ও ইকামাত যেহেতু দীনের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কাজ, তাই এর দাবি হচ্ছে, কাজ দু'টি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা চাই। পারিশ্রমিক নিতে বাধ্য হলে তা অন্যান্য দায়িত্বের বিনিময়ে গ্রহণ করা উচিত এবং কাজে যোগদানের পূর্বেই সে বিষয় মীমাংসা করে নেয়া চাই।

٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ -رواه أحمد وأبوداؤد والترمذى والشافعى

৪০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ইমাম হলো যামিন এবং মু'আয্‌যিন হলো আমানতদার। হে আল্লাহ্! ইমামদের সৎপথ দেখাও এবং মু'আযযিনদের ক্ষমা কর। (আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও শাফিয়ী)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তার নিজের সালাত ব্যতীত মুক্তাদীদের সালাতেরও যিম্মাদার। সুতরাং সাধ্যমত বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ সর্বদিক সুসামঞ্জস্য করে সালাতের ইমামতি করার চেষ্টা করা উচিত। মু'আয্‌যিনের আযানের উপর লোকেরা সাধারণত ভরসা করে থাকে। সুতরাং কঠোরভাবে নিজ প্রবৃত্তি দমন ও নিজকে বিশুদ্ধ চিত্ত করে যথাসময়ে আযান দেওয়া চাই। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইমাম ও মু'আযযিনের যিম্মাদারীর ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে দু'আ করেছেন।

٤١- عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِىْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَ اَقِيْمَا وَلْيَؤُمُّكُمَا اَكْبَرُ كُمَا - رواه البخارى

৪১. হযরত মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই নবী কারীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন ঃ যখন তোমরা উভয়ে সফর করবে তখন আযান দিবে ও ইকামত বলবে। তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে তোমাদের সালাতের ইমামতি করবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ সহীহ্ বুখারীর অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা) নিজ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খিদমতে যান এবং তাঁর সাহচর্য-ধন্য হওয়ার আশায় দীর্ঘ বিশদিন অবস্থান করেন। এ হাদীসে যে কথা বলা হয়েছে তা মূলত তাদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবার থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময়ের ঘটনা। এ পর্যায়ে তিনি তাদেরকে দু'টি বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন।

১. সফরে থাকাকালে আযান ও ইকামত দিবে। ২. তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন সালাতের ইমামতি করে। সম্ভবত ইল্‌মে দীন এর ক্ষেত্রে তাঁর সাথীগণ একই মানের ছিলেন, কারো উপর কারো বিশেষ মর্যাদা কিংবা মাহাত্ম্য ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্য বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন সালাতের ইমামতি করে। বলাবাহুল্য, ইমামতির ক্ষেত্রে এটাই নীতি।

আযান এবং মু'আয্‌যিনের মর্যাদা

٤٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ شَهِدَلَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ – رواه البخارى

৪২. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন জিন, কিংবা অন্য কোন বস্তু মু'আযযিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ বিশ্বের সমগ্র বস্তুতে তাঁর মা'রিফাত ছড়িয়ে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্‌র বাণী وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ "এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে না।" (১৭, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

কাজেই মু'আয্‌যিন যখন আযান দেয় এবং তাতে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য, একত্ব, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রিসালাত এবং দীনের দাওয়াত প্রকাশ পায় তখন

জিন্-ইনসান ব্যতীত অপরাপর সৃষ্টি ও তা শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে। এসব বস্তু কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আযান দানে এবং মু'আয্‌যিনের রয়েছে ঈর্ষণীয় মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

" এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।" (৮৩, সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ২৬)

٤٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ — رواه مسلم

৪৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ শয়তান যখন সালাতের আযান শুনে তখন (মদীনা থেকে) রাওহা নামক স্থানে চলে যায়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলে এমন অনেক সৃষ্টি রয়েছে যার একটি অপরটির জন্য অসহনীয় ও প্রতিপক্ষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে– অন্ধকারের কাজে সূর্য অসহ্য। কাজেই সূর্যের আলো ভেসে উঠে তখন সাথে সাথে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে শীতের কাছে গরমের খরতাপ অসহনীয়। কারণ যেখানে আগুন জ্বালান হয় সেখান থেকে শীত বিদায় নেয়। ঠিক তদ্রূপ হয় আযান শুনার পর শয়তানের অবস্থা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণীর মর্ম এটাই। কারণ শয়তান যখনই আযানের শব্দ শুনতে পায় তখন আলায়ে মদীনা থেকে পালিয়ে রাওহা নামক স্থানে চলে যায়। হযরত জাবির (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনাকারী তালহা ইব্ন নাফি সূত্রে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, মদীনা থেকে রাওহার দূরত্ব হল ছত্রিশ মাইল। আযানে তাওহীদ ও ঈমানের সূর ধ্বনিত হয় এবং আযান শুনে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা মসজিদে আসে- এই হচ্ছে আযানের মূল প্রাণশক্তি। পক্ষান্তরে অভিশপ্ত শয়তানের জন্য বোমার আঘাতস্বরূপ। মু'আয্‌যিন যখন আযান শুরু করে তখন শয়তান ঐভাবে পালিয়ে যায় যেভাবে আলোর উপস্থিতিতে অন্ধকার পালায়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٤٤- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ – رواه مسلم

৪৪. হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন মু'আয্‌যিনদের ঘাড় সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত اطول الناس اعناقا এর শাব্দিক অনুবাদ হলো– "দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট হবে।" কিন্তু ভাষ্যকারগণ এর একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই অধমের নিকট এর দ্বারা মু'আয্যিনের মাথা উঁচু করা ও মর্যাদা বৃদ্ধি বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন অপরাপর লোকদের তুলনায় তার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হবে। পরবর্তী হাদীসে কিয়ামতের দিন তারা মিশ্‌কের স্তুপের উপর অবস্থান করবে।

٤٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلاَهُ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلٰوةِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ رواه الترمذيا

৪৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি মিশ্‌কের স্তুপের উপর অবস্থান করবে। তারা হল ঃ ১. ক্রীতদাস যে আল্লাহ্ এবং তার মনিবের হক আদায় করে। ২. যে ব্যক্তি কোন কাওমের ইমামতি করে আর তারা (তার নেকআমল ও সদাচারের জন্য) তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং ৩. যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আযান দেয়। (তিরমিযী)

٤٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ - رواه الترمذى وأبوداؤد وابن ماجة

৪৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় একাধারে সাত বছর আযান দেবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্ধারিত রয়েছে যে জাহান্নাম তাকে স্পর্শও করতে পারবে না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ)

٤٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ وَالْمُلَبِّيْنَ يَخْرُجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ وَيُلَبِّى الْمُلَبِّىُ -- رواه الطبرانى فى الاوسط

৪৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'আয্যিনগণ এবং তালবিয়া[১] পাঠকগণ তাদের কবর থেকে যথাক্রমে মু'আয্যিন আযানদানরত অবস্থায় এবং তালাবীয়া পাঠক তালবীয়া পাঠরত অবস্থায় করব থেকে (কিয়ামতের মাঠের দিকে) বেরিয়ে আসবে। (তাবারাণী মু'জাম আওসাত গ্রন্থ)

ব্যাখ্যা ঃ আযান এবং মু'আযযিনের যে অসাধারণ সাওয়াব এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তার রহস্য হচ্ছে এই যে, আযান ঈমান ও ইসলামের প্রতীক এবং দীনের প্রভাবময়ী বিশিষ্ট অর্থবোধক দাওয়াত। মু'আয্যিন এই আহবানকারী। মনে করা যেতে পারে, সে আল্লাহ্ নির্বাচিত আহবায়ক। আফসোস! আজ আমরা মুসলিম জনগোষ্ঠি আযানের এই গূঢ় রহস্য ভুলে গেছি এবং আযান দেওয়া একটি তুচ্ছ পেশায় পরিণত হয়েছে। আলাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এই ভয়াবহ সামাজিক পাপ থেকে রক্ষা করুন এবং তাওবা ও সংশোধনের তাওফীক দিন।

٤٨- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ فَقَالَ اَحَدُكُمُ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ -- رواه مسلم

৪৮. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'আয্যিন যখন আল্লাহু আকবার বলে, তখন তোমাদের কেউ যদি (তার জবাবে) আল্লাহু আকবার বলে, তারপর মু'আয্যিন যখন আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে তখন সেও যদি বলে আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ; তারপর মু'আয্যিন যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ বলে, তখন যদি সেও বলে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, পরে মু'আয্যিন যখন 'হায়্যা

১. তালাবিয়া হচ্ছে হজ্জ ও উমরাকারী বিশেষ দু'আ আর তা হচ্ছে

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك

আলাস সালাহ' বলে, তখন সেও যদি 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলে; এরপর মু'আয্যিন যখন 'হায়্যা আলাল ফালাহ্' বলে, তখন সেও যদি 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলে, এরপর মু'আয্যিন যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে, তখন সেও যদি (জবাবে) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে, তারপর মু'আয্যিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে, তখন সে ও যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে– এসবই যদি সে আন্তরিকতার সাথে বলে থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ইতোপূর্বে পাঠকগণ জানতে পেরেছেন যে, আযানের দু'টি বিশিষ্ট দিক রয়েছে ১, জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের ঘোষণা দেওয়া এবং ২, ঈমান ও দীনের দাওয়াত। প্রথমটি তথা আযান শুনার পর প্রত্যেক মুসলমানের জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদের উদ্দেশ্য রওনা করা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আযানের ধ্বনি শুনার সাথে সাথে এর প্রতিশব্দের ঈমানী দাওয়াতে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য এবং মুখে ও অন্তরে তার প্রত্যয় ঘোষণা করা চাই। অনুরূপভাবে প্রত্যেক আযানের সময় ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়া চাই। নবী করীম ﷺ আযানের জবাবে দানের এবং দু'আয় কালিমা শাহাদাত পাঠের যে নির্দেশ দিয়েছেন ও অনুপ্রাণিত করেছেন এটাই তার রহস্য। এর দ্বারা একথাও পরিষ্কার বুঝা যায়, যে, আযানের মৌখিক জবাব আপাতদৃষ্টিতে একটি সাধারণ আমল মনে হলেও এর উপর ভিত্তি করে জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দানের রহস্য কী?

٤٩– عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِىْ وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَّبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ – رواه مسلم

৪৯. হযরত সা'দ ইবন্ আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মু'আয্যিনের আযান শুনে "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাদিতু বিল্লাহি রাববাওঁ ওয়া বি মুহাম্মাদির রাসূলাঁও ওয়া বিল ইসলামি দিনা" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্কে প্রতিপালকরূপে, মুহাম্মদ ﷺ কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট"–এই দু'আ পাঠ করবে তার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সৎকাজ করার ফলে যে পাপ বিমোচিত হয় সে বিষয় উযূর ফযীলাত অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে স্মরণ রাখা উচিত।

٥٠– عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –– رواه البخارى

৫০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে, হে আল্লাহ্! এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠত সালাতের তুমিই প্রভূ। হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে দান কর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মানিত স্থান এবং তাঁকে তোমার প্রতিশ্রুত প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর"– কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত হবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য তিনটি দু'আর বিষয় উল্লেখিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর উল্লিখিত তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দান করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে সে নির্ঘাত কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ এর শাফা'আত লাভ করবে। তিনটি বিষয় হলো– (১) ওয়াসীলা (২) ফাযীলাহ এবং (৩) মাকামে মাহমূদ। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূত্রে ওয়াসীলার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছ। ওয়াসীলা হলো, আল্লাহ্র প্রেমের এক বিশেষ মাকাম ও মর্যাদার স্থান এবং জান্নাতের একটি অনন্য মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। আর তা কেবল তাঁর একজন বান্দারই ভাগ্যে জুটবে। ফাযীলাহ ও একটি বিশেষ মাকাম। মাকামে মাহমূদ হচ্ছে এমন সম্মানজনক মাকাম যিনি এতে ধন্য হবেন, তিনি হবেন একজন প্রশংসিত ও সম্মানিত ব্যক্তি এবং সবাই তাঁর গুণ-কীর্তনে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সততঃ মশগূল থাকবে।

এ পর্যায়ে মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডে শাফা'আতের বর্ণনায় সবিস্তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। সে হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন হবে এমনই একটি দিন যাতে আল্লাহ্ তাঁর মাহাত্ম্য ও শক্তিমত্তা নিয়ে প্রকাশিত করেন এবং বিশ্ব মানবতা নিজ নিজ আমল বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে অস্থির থাকবে, এমনকি হযরত নূহ্, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আ) প্রমুখ নবী-রাসূলগণও তখন কোন বিষয়ে আরযি পেশ করার সাহস পাবেন না। নবীগণের দলপতি হযরত মুহাম্মদ ﷺ তখন বলবেন ঃ হে মহান বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক! আমি এর জন্য প্রস্তুত, বলে গোটা মানব জাতির জন্য হিসাবও শাফা'আতের লক্ষ্যে এগিয়ে আসবেন। তিনি

পাপীদের সুপারিশ করার এবং জাহান্নামীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানানোর ক্ষেত্রে হবে পথিকৃৎ। তিনি নিজেই ইরশাদ করেন ঃ "আমিই হব সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী এবং আমার শাফা'আতই সর্বাগ্রে গ্রহণ করা হবে।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আমি হব প্রশংসার পতাকাবাহী। আদম (আ) থেকে শুরু করে সবাই আমার পতাকা (লেওয়াহে হামদের) নিচে সমবেত হবে, কিন্তু এতে আমার বিন্দুমাত্র গর্ব নেই।"

বলাবাহুল্য, এ-ই হচ্ছে মাকামে মাহমূদ যে বিষয় কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا

"আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (১৭, সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৭৯)

হাদীসে এই একান্ত বিশেষ মর্যাদাকে ওয়াসীলা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসে যাকে ওয়াসীলা ও ফাযীলাহ্ বলা হয়েছে, তাই কুরআন মজীদেও এই হাদীসে 'মাকামে মাহমূদ' বলা হয়েছে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই মর্যাদায় ভূষিত হবেন এবং এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুবারক নাম তালিকাভুক্ত করে রেখেছেন। তবে তাঁর এই মর্যাদার পাশাপাশি হাদীসের ব্যাখ্যায় আমাদেরকে তার জন্য এই মর্যাদা দানের দু'আ করতে বলা হয়েছে যেন আল্লাহ্ তাঁকে এই মহান মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই মর্মে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার জন্য এই দু'আ করবে তার জন্য আমার শাফা'আত নির্ধারিত।

জ্ঞাতব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীসের মর্মানুযায়ী আমল করার নিয়ম হচ্ছে এই যে, হযরত উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে যেরূপ উদ্ধৃত হয়েছে তদ্রুপ মু'আয্যিনের আযান দেওয়ার সাথে সাথে অনুরূপ বাক্য মুখে উচ্চারণ করা। এরপর হযরত সা'দ (রা) বর্ণিত হাদীসের আলোকে "আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা। এরপর আল্লাহ্র কাছে নিম্নবর্ণিত দু'আ করা

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ .....

হাফিয ইব্ন হাজার (র) "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় এই দু'আর শেষ অংশে اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করে না অঙ্গীকার) রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে উপরে বর্ণিত কাজসমূহের মর্ম উপলব্ধি করে কাজে পরিণত করার তাওফীক দিন।

মসজিদ

মসজিদের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব, আদব ও হক

সালাতের সাথে যে সব বাক্য উদ্দেশ্য জড়িত সে বিষয়ে ইতোপূর্বে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর বরাত আমি কিন্তু ইঙ্গিত করেছি। এগুলো পূর্ণভাবে অর্জনের জন্য একত্রে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা জরুরী। ইসলামী শরী'আতে এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মসজিদ নির্মাণ ও জামা'আতের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। চিন্তাশীল মানুষ একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, এই উম্মাতের ধর্মীয় জীবনের এবং শৃঙ্খলা ও সুবিন্যস্ত জীবন বিনির্মাণে মসজিদ এবং জামা'আতের গুরুত্ব কতখানি। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং জামা'আত বর্জনের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। (আলোচনা একটু আসছে) অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং কা'বা ঘরের পরেই এমনকি কা'বার সাথে সম্পর্কিত করে মসজিদকে আল্লাহ্র ঘর এবং উম্মাতের দীনী মিলনকেন্দ্র ঘোষণা করেছেন। তারপর তিনি এর বরকত, মাহাত্ম্য ও পসন্দনীয় দিক ঘোষণা করে উম্মাতকে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করেছেন। যাতে সর্বক্ষণ তাদের অন্তর মসজিদের সাথে সম্পর্কিত থাকে। এবং মসজিদের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর সাথে তিনি মসজিদের হকসমূহ ও পালনীয় রীতিনীতির ব্যাপারে দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক হাদীস পাঠ করা যাক ঃ

٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا --- رواه مسلم

৫১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয় স্থান হলো মসজিদ এবং সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয় স্থান হলো বাজার। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মানব জীবনের দু'টি ধারা রয়েছে। একটি হলো আধ্যাত্মিক এবং অপরটি বৈষয়িক ও পাশবিক। আধ্যাত্মিক অনিবার্য দাবি হলো, আল্লাহ্র

ইবাদাত, যিক্‌র-আযকার ও অপরাপর সৎকাজে মশগুল থাকা। এভাবে এ ধারার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত লাভ করে এবং তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। উল্লেখ্য এ সকল কাজ আঞ্জাম দেওয়ার শ্রেষ্ঠতম স্থান হলো মসজিদ। কেননা ইবাদত ও যিক্‌র-আযকারের জন্যই মূলত মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে। এদিক থেকে বায়তুল্লাহ্‌র সাথে রয়েছে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এজন্যই মানুষের আবাস গৃহের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় স্থান হলো মসজিদ। পক্ষান্তরে হাট-বাজার মানুষের বৈষয়িক ও পাশবিক প্রবৃত্তির দাবি পূরণের কেন্দ্ররূপে বিবেচিত। আর মানুষ সেখানে প্রবেশ করে আল্লাহ্ সম্পর্কে বে-খবর হয়ে পড়ে। এর ফলে তার অন্তরে পাপাচারের ময়লার স্তূপ জমে যায়। এজন্যেই বাজার আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মানুষের আবাসগৃহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান বলে বিবেচিত।

তবে হাদীসের মূল দাবি হচ্ছে এই যে, মু'মিন লোকদের উচিত বেশির ভাগ সময় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং তা মিলন কেন্দ্রে পরিণত করা এবং একান্ত বিশেষ প্রয়োজনে বাজারে যাওয়া। তবে বাজারের কলুষিত পরিবেশের সাথে যাতে অন্তর বদ্ধমূল হয়ে না পড়ে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, প্রতারণা করা, খিয়ানত করা ইত্যাদি কাজ থেকে নিজকে হিফাযত রাখা একান্ত কর্তব্য। এ সকল বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই কেবল হাট-বাজারের সাথে সম্পর্ক রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য এহেন সদাচারী ও সত্যপন্থী ব্যবসায়ীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন। বাজারকে পায়খানার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কেননা পায়খানা অপসন্দনীয় ও রুচি পরিপন্থী স্থান তবুও যেমন প্রয়োজনে সেখানে যেতে হয়, বাজারের বিষয়টিও তদ্রূপ। বরং মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কাজ যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল প্রদর্শিত নির্দেশ মুতাবিক সম্পন্ন করে, তবে সেজন্য রয়েছে বিরাট সাওয়াব ও প্রতিদান।

٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ، اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ -- رواه البخارى ومسلم

৫২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেদিন আল্লাহ্ প্রদত্ত ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাঁর নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন–

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,
২. সেই যুবক যার জীবন শিশুকাল থেকে গড়ে ওঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদাতের মাঝে এবং যৌবনেও বিপথগামী হয়নি,
৩. সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লটকে আছে,
৪. সেই দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসে, একত্র হয় আল্লাহ্‌র জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহ্‌র জন্য,
৫. সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, ফলে তার দুই চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়,
৬. সেই ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী অভিজাত রমনী অবৈধ কাজের প্রতি আহ্বান জানায়, কিন্তু সে তা একথা বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি,
৭. সেই ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত খরচ করে অথচ বাম হাত জানে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের তৃতীয় নম্বরে বলা হয়েছে যে, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লটকে থাকে কিয়ামতের দিন রহমতের ছায়াযুক্ত স্থানের সুসংবাদ দান করা হয়েছে। মু'মিন লোকের অবস্থা এরূপ হওয়া একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা উপরে বর্ণিত সাত শ্রেণীর মধ্যকার যে কোন শ্রেণীর মধ্যে আমাদের শামিল করুন।

٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ غَدَا اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ- رواه البخارى ومسلم

৫৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য ততবার মেহমানদারীর আয়োজন করে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, কোন লোক সকাল কিংবা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায় আল্লাহ্ তা'আলা তার এই মেহমানের প্রতি ততবার বিশেষ খেয়াল

রাখেন এবং তার প্রতি উপস্থিতির জন্য জান্নাতে আপ্যায়নের বস্তু বিশেষভাবে প্রস্তুত করে থাকেন। বান্দা জান্নাতে পৌঁছার পর তা সামনে উপস্থিত পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে উক্ত অতিথিদের যে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে রেখেছেন এ পৃথিবীতে তার কল্পণাও করা যায় না। এ বিষয়ে কানযুল উম্মালে তারিখে হাকিমের বরাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নিম্নবর্ণিত শব্দযোগে বিধৃত হয়েছে ঃ

اَلْمَسَاجِدُ بُيُوْتُ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ زُوَّارُ اللّٰهِ وَحَقَّ عَلَى الْمَزُوْرِ اَنْ يُّكْرِمَ زَائِرَهُ

"মসজিদসমূহ আল্লাহ্র ঘর। এতে আগমণকারী মু'মিনগণ আল্লাহ্র মেহমান। সুতরাং যার সাক্ষাতে কেউ আসে তার উচিত আগন্তুকের হক আদায় করা এবং যথাযথভাবে তার আপ্যায়ন করা।" (কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪)

কানযুল উম্মলে তারীখে হাকিম সূত্রে উপরে যে রিওয়ায়া ৩টি বর্ণিত হয়েছে তা হাদীস বিশারদগণের নিকট যাঈফ (দুর্বল) রূপে বিবেচিত। কানযুল উম্মালের গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয় পরিষ্কার আলোচনা করেছেন। তার উক্ত রিওয়ায়াত ৩টি হযরত আবূ হুরায়র (রা.) বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের পূর্বোল্লিখিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় হাদীসটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেছি।[১]

٥٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَفِىْ سُوْقِهٖ خَمْسَةً وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَالِكَ اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رُفِعَتْ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً فَاِذَا صَلَّى عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ - رواه البخارى

৫৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায়ের সাওয়াব তার নিজের ঘরে কিংবা বাজারে আদায়কৃত সালাতের সাওয়াব থেকে পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে উযূ করেন, তারপর একমাত্র

১. কানযুল উম্মালে একই বিষয়ের উপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে মু'জামুত তাবারানী বরাতে অন্য একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা হয়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি করে মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি পাপ ক্ষমা করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে, ফিরিশ্তাগণ তার জন্য জন্য এই বলে দু'আ করেন–"হে আল্লাহ্! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর এবং তার প্রতি দয়া কর।" তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতরত বলে গণ্য হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নিজ বাড়ীতে কিংবা বাজারে সালাত আদায়ের চাইতে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ে পঁচিশ গুণ সাওয়াব রয়েছে এবং মসজিদের দিকে প্রতি পদক্ষেপে একটি করে সাওয়াব দান এবং একটি করে পাপমোচন করা হয়। এ কতই না মূল্যবান অথচ কত সস্তা সম্পদ। এতদ্ব্যতীত রয়েছে ফিরিশতাকুলের দু'আ-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ

"হে আল্লাহ্! তুমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ কর এবং তার প্রতি দয়া কর।" এই রিওয়ায়াতের শেষাংশে নিম্নোক্ত ও বর্ণিত হয়েছে–

" مَالَمْ يُؤْذِنِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ

"সালাত আদায়ের পর মসজিদে প্রতীক্ষাকারী মুসল্লীর জন্য ফিরিশ্তাগণ দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় কিংবা উযূ ভঙ্গ না করে।"

٥٥- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَئْذَنْ لَنَا فِى التَّرَهُّبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تَرَهُّبَ اُمَّتِىْ الْجُلُوْسُ فِى الْمَسْجِدِ اِنْتِظَارَ الصَّلٰوةِ - رواه فى شرح السنة

৫৫. হযরত উসমান ইব্ন মাযঊন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে বৈরাগ্য অবলম্বনের অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মাতের বৈরাগ্য হচ্ছে সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা। (শারহুস্ সুন্নাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন সাহাবীর মধ্যে দুনিয়া ত্যাগের ও বৈরাগ্যের জীবন অবলম্বনের অনুভূতি জেগেছিল। এই হাদীসে তাঁদের সেই প্রশ্নই স্থান পেয়েছে। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত উসমান ইব্ন মাযউন (রা) ছিলেন ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। একদা তিনি এমনই কিছু বিষয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে পেশ করেন। তার বক্তব্যের শেষ কথা ছিল এই যে, আমি আপনার কাছে বৈরাগ্যের জীবন যাপনের অনুমতি প্রার্থনা করছি। কাজেই আপনি

অনুমতি দিন যাতে আমি দুনিয়া ত্যাগী হতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ পর্যায়ে যে উত্তর দেন তার মর্ম হল এই যে, যে আধ্যাত্মিক এবং পারলৌকিক উদ্দেশ্যে হাসিলের পূর্ববর্তী উম্মাতের জন্য বৈরাগ্য ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার উম্মাতের মসজিদে সালাতের জন্য প্রতীক্ষাকারীকে তা দান করবেন এবং এ-ই হচ্ছে আমার উম্মাতের বৈরাগ্য। প্রকৃতপক্ষে, সালাতের জন্য মসজিদে প্রতীক্ষা করা এক ধরনের ইতি'কাফ। আফসোস, আমরা যদি এর মূল্য অনুধাবন করতাম!

٥٦- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيمَةِ - رواه الترمذى وأبو داؤد

৫৬. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যারা অন্ধকারে মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতি প্রাপ্তির সুসংবাদ দাও। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাতের ঘোর অন্ধকার উপেক্ষা করে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য মসজিদে গমন করা নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য কাজ এবং আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্কের অকাট্য দলীল। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের যবানীতে সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার এহেন কাজের পুরস্কার স্বরূপ কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতি দান করবেন। فَبُشْرٰى لَهُمْ وَطُوْبٰى لَهُمْ "তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এবং সন্তোষ।"

মসজিদে প্রবেশের ও বের হওয়ার দু'আ

٥٧- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - رواه مسلم

৫৭. হযরত আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বলে - اَللّٰهُمَّ " افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ "হে আল্লাহ্! তুমি তোমার করুণার দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করে দাও।"

আর যখন বের হয় তখন যেন বলে " اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " "হে আল্লাহ্! আমি তোমার ফযল ও অনুগ্রহ কামনা করি।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন ও হাদীসে 'রহ্মত' শব্দটি আখিরাতে বিশাল দয়া ও করুণার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর 'ফায্ল' শব্দটি দুনিয়ায় জীবিকা ও অপরাপর প্রচুর নি'আমত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশকালে রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মসজিদে দীনি, আধ্যাত্মিক ও আখিরাতে নি'আমত অর্জনের শ্রেষ্ঠতম স্থান এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র ফযল ও অনুগ্রহ চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা মসজিদ থেকে বের হয়ে দুনিয়ার জীবনে এ দু'আ করাই বাঞ্ছনীয়। এ উভয় দু'আর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, মানুষ যাতে মসজিদে প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় সর্বতোভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়।

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

٥٨- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ- رواه البخارى ومسلم

৫৮. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন মসজিদে বসার পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র সাথে মসজিদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এ সম্পর্কের সূত্র ধরে মসজিদকে আল্লাহ্র ঘর বলা হয়। মসজিদের হক ও প্রবেশের আদব হচ্ছে এই যে, সেখানে প্রবেশ করে প্রথমত বসার পূর্বেই দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিবে। এ যেন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দরবারে সালাত পেশ করা। এ জন্যই এ সালাতকে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বলা হয়। অবশ্য অধিকাংশ ইমামের মতে এই সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

জ্ঞাতব্য ঃ এই হাদীসে এ মর্মে পরিষ্কার নির্দেশ এসেছে যে, মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা চাই। কখনো কখনো দেখা যায় যে, মুসল্লীরা মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে স্বেচ্ছায় কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে। না জানি কোত্থেকে এই ভ্রান্ত প্রথার প্রচলন হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (র)-এর বিবরণ থেকে জানা

যায় যে, চারশ বছর পূর্বে তাঁর যুগেও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে এই ভ্রান্ত রুসম চালু ছিল।

٥٩- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَءَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ--- رواه البخارى ومسلم

৫৯. হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর শেষে কেবলমাত্র দিনের বেলা চাশ্‌তের সময় বাড়ী ফিরতেন। তবে যখনই আসতেন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করে সেখানে কিছুক্ষণ বসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অপরাপর হাদীস সূত্রে সবিস্তার জানা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন তখন মদীনার অদূরে কোথাও শেষ অবস্থান নিতেন। ফলে মদীনায় এ মর্মে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ত যে, তিনি অমুক স্থানে যাত্রা বিরতি করছেন এবং আগামীকাল ভোরে মদীনার তাশরীফ আনবেন। তারপর তিনি ভোরবেলা রওয়ানা করে চাশ্‌তের সময় মদীনায় উপস্থিত হতেন এবং প্রথমে মসজিদে অবস্থান নিতেন। তিনি যেন তাঁর ঘরে প্রবেশের পূর্বে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর ইবাদতের নযরানা পেশ করতেন। তারপর কিছুক্ষণ মসজিদে অবস্থান করতেন এবং সাক্ষাৎ প্রার্থীরা তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করে ধন্য হতেন। এই ছিল মসজিদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বোত্তম আদর্শিকে নমুনা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এর মর্ম বুঝার এবং তা অনুসরণ করার তাওফীক দিন।

মসজিদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ঈমানের লক্ষণ

٦٠- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْإِيْمَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» -رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

৬০. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কাউকে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে, তখন তার ঈমানের সাক্ষ্য দিবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে।" (৯, সূরা তাওবা ঃ ১৮) (তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ্ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ আল্লাহ্‌র ইবাদতের কেন্দ্রস্থল এবং দীনের অন্যতম প্রতীক। কাজেই এর সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ও তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং মসজিদকে আল্লাহ্‌র ইবাদত দ্বারা আবাদ করা কর্তব্য। এগুলো সাচ্চা ঈমানের লক্ষণ ও প্রমাণ।

মসজিদ পরিষ্কার করা এবং সুগন্ধময় করে রাখা

٦١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ - رواه أبوداؤد والترمذى وبن ماجه

৬১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুগন্ধিময় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ যেসব এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠেছে সেসব এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করা উচিত এবং সর্ববিধ ময়লা থেকে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। মসজিদে সুগন্ধি ছিটানো চাই। মসজিদের ধর্মীয় গুরত্ব এবং আল্লাহ্‌র সাথে এর সম্পর্কে এটাই দাবি।

মসজিদের নির্মাণের সাওয়াব

٦٢- عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ- رواه البخارى ومسلم

৬২. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন-হাদীস-এর অসংখ্য বাণী থেকে জানা যায় যে, আখিরাতে প্রত্যেক কাজের যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হবে। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে,

মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য জান্নাতে একটি চমৎকার মহল নির্মাণ করা যুক্তি সঙ্গত।

মসজিদের বাহ্যাড়ম্বর ও শান-শওকত অপসন্দীয়

٦٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى - رواه أبوداؤد

৬৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি মসজিদকে (অতিরিক্ত) উঁচু ও চাকচিক্যময় করতে আদিষ্ট হই নি। এ হাদীস বর্ণনা করার পর বর্ণনাকারী ইব্ন আব্বাস (রা) ভবিষ্যতবাণী করেন এমন সময় আসবে যখন তোমরা ইয়াহূদী- নাসারাদের ন্যায় তা চাকচিক্যময় করে তুলবে। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী-"আমি মসজিদকে চাকচিক্যময় করতে আদিষ্ট হই নি।" এর মর্ম হচ্ছে এই যে, মসজিদের বাহ্যাড়ম্বর ও চাকচিক্য অবস্থা কোন প্রশংসনীয় কাজ নয়। বরং মসজিদ সাদসিধে করে নির্মাণ করাই সমীচীন। এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) উম্মাতের ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন। তার কারণ হয়ত এই যে তিনি কোন এক সময় নবী ﷺ এর নিকট থেকে এ বিষয় শুনে থাকবেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন-"আমার দেখতে পাচ্ছি এমন এক সময় আসবে যখন (আমি তোমাদের মধ্যে থাকব না) তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করে তুলবে যেমনিভাবে ইয়াহূদীরা তাদের উপাসনালয় ও খ্রিস্টানরা তাদরে গির্জা আড়ম্বরপূর্ণ ও চাকচিক্যময় করে থাকে।"

আবার এটাও সম্ভব যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) মুসলমানদের মেযাজ, মন-মানসিকতা ও জীবন পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ্য করে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবে তার ভবিষ্যদ্বাণী যে অবস্থার প্রেক্ষিতেই হোক না কেন তা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কেননা উপমহাদেশে আমরা এমন সব চাকচিক্যময়পূর্ণ মসজিদ দেখতে পাই যার সাথে ইয়াহূদী-নাসারাবাদের উপাসনালয়ের কোন তুলনাই হয় না।

(٦٤) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ- رواه أبوداؤد والنسائى والدارمى وابن مَاجة

৬৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মসজিদ নিয়ে গর্ববোধ কিয়ামতের নিদর্শন সমূহের অন্যতম (নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মসজিদ নির্মাণ করবে)। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামতের লক্ষণসমূহের মধ্যে এমনও কতিপয় নিদর্শন রয়েছে যা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার নিকট সময়ে প্রকাশিত হবে। যেমন- দাজ্জালের আবির্ভাব, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া ইত্যাদি। কতিপয় এমন লক্ষণও রয়েছে যা কিয়ামতের পূর্বে কোন এক সময় প্রকাশিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উম্মাতের মধ্যে যে সকল অনিষ্ট ও ফিতনার আশংকা করেছেন এবং কিয়ামতের লক্ষণ বলেছেন তার অধিকাংশই এরূপ। আর মসজিদ নিয়ে পরাস্পরিক গর্ববোধও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিমগণ বহু পূর্বে থেকে এ অবস্থার শিকার হয়েছেন। হে আল্লাহ্! উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সংশোধিত হওয়ার তাওফীক দিন।

দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু আহার করে মসজিদে আসা নিষেধ

٦٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ - رواه البخارى ومسلم

৬৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ আহার করবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে। কারণ মানুষ যাতে কষ্ট অনুভব করে, ফিরিশ্তাগণও তাতে কষ্ট পায়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদকে সব ধরনের দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখা মসজিদের ধর্মীয় গুরুত্ব ও আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এর সম্পর্কের অনিবার্য দাবি। বলাবাহুল্য, পিয়াজ-রসূনে রয়েছে এক ধরনের দুর্গন্ধ। কোন কোন এলাকায় উৎপাদিত পিয়াজ রসূনের দুর্গন্ধ অত্যন্ত উৎকট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যামানায় লোকেরা কাঁচা পিয়াজ-রসুন খেত। এজন্যই তিনি এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেউ যেন তা

খেয়ে মসজিদে না আসে। তিনি এর কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ যে বস্তু সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে কষ্ট দেয় তা আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাদেরও কষ্ট দেয়। ফিরিশ্‌তারা অধিক হারে মসজিদে আনাগোনা করে থাকেন। বিশেষ করে সালাত আদায়ের সময় মানুষের সাথে তাদের এক বিরাট জামা'আত শরীক হয়। কাজেই এহেন সম্মানিত অতিথিদের যাতে দুর্গন্ধ কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ পিয়াজ-রসুন সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ দু'টি বস্তু খেয়ে যেন কেউ আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে। এই হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, "কারো যদি এগুলো বস্তু খেতেই হয়, তবে যেন পাক করে খায় যাতে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়"।[১]

এ সব হাদীসে যদিও পিয়াজ-রসূনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে তবুও সুস্থ মানুষকে কষ্টদায়ক সর্ববিধ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকর হবে।

মসজিদে কবিতাবাজি এবং ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

٦٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَنَاشُدِ الاَشْعَارِ فِيْ الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالاِشْتِرَاءِ فِيْهِ وَاَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ - رواه أبو داؤد والترمذى

৬৬. আম্‌র ইব্‌ন শুআয়ব (র) পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মসজিদে কবিতাবাজি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমু'আর দিন জুমু'আর সালাতের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যেসব কাজ জায়িয হলেও আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দীনের সাথে সম্পর্কহীন (যেমন, ব্যবসায় বা বিনোদনমূলক অথবা কাব্য ও সাহিত্য মজলিস) এহেন কাজের জন্যও মসজিদ ব্যবহার না করা চাই। মসজিদে কবিতাবাজি ও ক্রয়-বিক্রয় নিষেধের এটাই হচ্ছে ভিত্তি। হাদীসের শেষাংশ জুমু'আর দিনের যে বিষয় রয়েছে তার মর্ম হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য প্রথম ওয়াক্তেই মসজিদে আসে (যে বিষয়ে হাদীসে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে) সে যেন একাগ্রতার সাথে ইবাদাতে মশগূল থাকে এবং মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে না বসে। আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

১. এ রিওয়ায়াতটি মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররা (রা) সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেছেন।

অবোধ শিশু ও হট্টগোল ইত্যাদি থেকে মসজিদ মুক্ত রাখা

٦٧- عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَرَفْعَ اَصْوَاتِكُمْ وَاِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ - رواه ابن ماجة

৬৭. হযরত ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা অবোধ শিশু, উন্মাদ (কে মসজিদে আসা থেকে) দূরে রাখ, তেমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, উচ্চঃস্বর-হট্টগোল, শাস্তি কার্যকর করা এবং তরবারি কোষমুক্ত করা থেকে তোমাদের মসজিদকে মুক্ত রাখো (এসব মসজিদের আদব পরিপন্থী কাজ যেন না হয়। (ইব্‌ন মাজাহ)

মসজিদে দুনিয়ার কথা বলা নিষেধ

٦٨- عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ فِىْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِ حَاجَةٌ -رواه البيهقى شعب الايمان

৬৮. হযরত হাসান বাস্‌রী (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ মানব সমাজে এমন সময় আসবে যে, মানুষ মসজিদে দুনিয়া সম্পর্কিত কথায় মত্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে বসো না এবং আল্লাহ্‌রও তাদের কোন প্রয়োজন নেই। (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। কাজেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিপন্থী এবং ধর্ম বিবর্জিত আলোচনায় মত্ত না হওয়া এর মর্যাদা রক্ষার অনিবার্য দাবি। তবে হ্যাঁ, মুসলিম জনগোষ্ঠির কোন জাতীয় বা সামাজিক বিষয় সম্পর্কে, চাই তা মুসলমানদের জীবনের যে কোন বিষয় হোক না কেন, পরামর্শ করা যেতে পারে। কিন্তু এমতাবস্থায়ও মসজিদের সাধারণ মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। এর আরেকটি শর্ত হল, যা কিছু হবে তা হবে আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশের আওতায় বিরুদ্ধে নয়, হিদায়াতমুক্ত নয়।

জ্ঞাতব্যঃ এ হাদীসের বর্ণনাকারী একজন খ্যাতিমান তাবিঈ। তিনি এই হাদীসটি হয়তবা কোন সাহাবী সূত্রে পেয়েছেন। কিন্তু তিনি উক্ত সাহাবীর সূত্র

উল্লেখ করেন নি। সুতরাং কোন তাবিঈ যদি সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে হাদীস বর্ণনা করেন তবে তাকে হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় 'মুরসাল' বলা হয়। আলোচ্য হাদীসটিও মুরসাল।

মসজিদে মহিলাদের সালাত আদায়ের অনুমতি

٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اسْتَاذَنَكُمْ نِسَائُكُمْ بِاللَّيْلِ فَأْذَنُوْلَهُنَّ - رواه البخارى ومسلم

৬৯. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ রাতে মসজিদে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের অনুমতি দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ -رواه ابوداؤد

৭০. হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে ঘরে সালাত আদায় করাই তাদের জন্য উত্তম । (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবনকালে যখন মসজিদে নববীতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করতেন, তখন তিনি একথা পরিষ্কার করে বলেছেন ঃ মহিলাদের নিজ ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম এবং তাতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। বহু সংখ্যক সতী সাধবী নারী একান্তভাবেই আগ্রহী ছিলেন যে, তাঁরা কমপক্ষে তাঁর পিছনে এশা ও ফজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করবেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক তাদের স্ত্রীদের অনুমতি দিচ্ছিলেন না। তবে তাঁদের অনুমতি না দেওয়ার পেছন কোন ফিতনা কিংবা কু-ধারণা নিহিত ছিল না। কারণ তখন পুরো সমাজ ইসলামী ভাবধারা অবগাহিত ছিল। বরং শরী'আত পরিপন্থী একটি চেতনাই নিষেধের ভিত্তি ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা রাতের সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ে আগ্রহী, তোমরা তাদের অনুমতি দিবে। কিন্তু তিনি নারীদের সর্বদা একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, নিজ ঘরে সালাত আদায়ে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক সাওয়াব। পরবর্তী হাদীস থেকে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

٧١- عَنْ اُمِّ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّةِ اَنَّهَا جَائَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ الصَّلٰوةَ مَعَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَلِمْتُ فِىْ بَيْتِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتُكِ فِىْ حُجْرَتِكِ اَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلٰوةَ مَعِىَ وَصَلٰوتِكِ فِىْ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتُكِ فِىْ دَارِكِ بَيْتِكِ وَخَيْرٌ مِنْ صَلٰوتِكِ فِىْ دَارِكِ وَ صَلٰوتُكِ فِىْ دَارِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلٰوتُكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِكِ فِىْ مَسْجِدِىْ - رواه أحمد (كنزالعمال)

৭১. হযরত উম্মু হুমায়দ সাঈদিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি আপনার সাথে সালাত আদায় করতে আগ্রহী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি আমার সাথে (জামা'আতে) সালাত আদায়ে আগ্রহী। তবে (শরী'আতের বিধান হল) তোমার ঘরের বাইরের অংশে সালাত আদায়ের চাইতে তোমার ঘরের ভিতরের অংশে সালাত আদায় করা উত্তম। নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় সালাত আদায়ের চাইতে তোমার ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম। নিজ মহল্লার মসজিদে সালাত আদায়ের চাইতে তোমার নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় সালাত আদায় করা উত্তম। আমার মসজিদের (মসজিদে নববী) চাইতে তোমার মহল্লার মসজিদে সালাত আদায় করা তোমার জন্য উত্তম। (কানযুল উম্মাল, ইমাম আহ্মাদ (র) এর বরাতে)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস ছাড়াও অনেক হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহিলাদের মসজিদের সালাত আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাণী প্রদান করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মনে ঘরে সালাত আদায়ে অনেক সাওয়াব হওয়ার বিষয়টি স্থান পেলেও তাঁরা এতটুকু আবেগপ্রবণ হয়েছিলেন যে, কমপক্ষে তাঁরা রাতে মসজিদে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে সালাত আদায় করবেন।

এ আবেগের মূলে ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি তাদের ঈমানী ভালবাসা। কারণ সে যুগে কোন ধরনের ফিতনার আশংকা ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের স্ত্রীরা রাতের সালাত আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদে যাবার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের অনুমতি দিবে। বলাবাহুল্য, মহিলাদের মসজিদে যাবার অনুমতি তখন কার্যকর ছিল, যখন কোন প্রকার ফিতনার আশংকা ছিল না। কোন কোন সাহাবী নিজ চিন্তা-চেতনার বশবর্তী হয়ে নিজ স্ত্রীদের মসজিদ

যেতে বারণ করতেন। তারপর নারী পুরুষ উভয় মহলে যখন দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ফিতনার তীব্র আশংকা সৃষ্টি হয় তখন হযরত আয়েশা (রা) (যিনি মহিলাদের ভেতর-বাইর সর্ববিধ বিষয়ে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেযাজ মরযি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন) যা বলেন তা পরবর্তী হাদীস থেকে জানা যাবে।[১]

٧٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْاَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ- رواه البخارى ومسلم

৭২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বর্তমানকালের মহিলাদের দেখতেন, তবে তিনি স্বয়ং তাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন, যেমনিভাবে-বনী ইসরাঈলের মহিলাদের (এসব কারণে) মসজিদে আসতে বারণ করা হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এ ভাষ্য হযরত আয়েশা (রা) এর। তিনি অধিকাংশ সাহাবীর বরাতে বলেন, বর্তমান যুগে মহিলাদের মসজিদে না যাওয়া উচিত। এরপর সমাজ ব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তাতে একথা স্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দানের প্রশ্নই উঠে না।

১. আলোচ্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় যা লেখা হয়েছে তা মূলত হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) প্রণীত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা থেকে সংগৃহীত। (২য় খণ্ড, পৃ. ২৬)

জামা'আত

সালাত অধ্যায়ের শুরুতে একথা পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সালাত কেবল ফরয ইবাদতই নয় বরং ঈমান ও ইসলামের অন্যতম প্রতীক। যথাযথভাবে সালাত আদায় করা মুসলিম হওয়ার প্রমাণ এবং তা বর্জন দীনের প্রতি উদাসীনতার নামান্তর ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সম্পর্কহীনতার লক্ষণ। সালাত আদায়ের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, বান্দা যেন লোকচক্ষুর সামনে তা আদায় করে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র এই নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্য জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের সুব্যবস্থা করেন এবং অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন উযর না থাকা পর্যন্ত জামা'আতে সালাত আদায় অপরিহার্য ঘোষণা করেন। আমার মতে, জামা'আতে সালাত আদায়ের বিশেষ রহস্য হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা বান্দার পাঁচবার হিসাব গ্রহণ করা হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যেতে পারে যে, যারা নিজ ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা কাটিয়ে নিয়মিত সালাত আদায় করতে পারে না তারাও জামা'আতবদ্ধভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার মধ্য দিয়ে নিয়মিত মুসল্লী হয়ে যায়। তাছাড়া জামা'আতের সালাত আদায়ের পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহ্র দীনী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি বিশেষ দিকও বটে। অনুরূপভাবে এটা পারস্পরিক খোঁজ নেয়ার এক অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি যার বিকল্প অচিন্তনীয়।

জামা'আতের সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহ্ ইবাদতে অধিক মশগুল হয়। এত সে আল্লাহ্ অভিমুখী হয় এবং তার অন্তরে এর বিশেষ প্রভাব পড়ে। ফলে আসমানী রহমত প্রাপ্ত হয়ে। আল্লাহ্র সাথে তার আন্তরিক বন্ধন স্থাপিত হয় এবং (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন হাদীসের বর্ননা অনুযায়ী) সালাতে ফিরিশ্তাদের অংশগ্রহণের ফলে মানুষ ও ফিরিশ্তাদের সহাবস্থান ও সান্নিধ্য লাভ ঘটে। এও হচ্ছে জামা'আত সালাত আদায়ের অন্যতম বরকত। এতদ্ব্যতীত জামা'আতের সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত' সালাত, সপ্তাহান্তে জুমু'আর সালাত এবং বছরে দুই বার ঈদের সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের মধ্য দিয়ে যে আরো বৃহত্তর ধর্মীয় ঐক্য ও সংহতির ব্যাপক উপকার লাভ করা যায়, তা অনুধাবন করা

বর্তমান কালের প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত সহজ। মোটকথা জামা'আতে সালাত আদায়ে এহেন বরকত ও উপকারিত নিহিত থাকায় প্রত্যেকের উপর জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, যতক্ষণ না এমন কোন উযর পরিদৃষ্ট হয় যা জামা'আতে সালাত আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জামা'আতে সালাত আদায়ের যে শিক্ষা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছেন মানুষ যত দিন যথাযথভাবে কার্যকারী ছিল ততদিন পর্যন্ত -মুনাফিক অথবা অপারগ ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেকেই জামা'আতে সালাত আদায়ে করতেন এবং এতে অসতর্কতাকে মুনাফিকের লক্ষণ বলে মনে করতেন। এই ভূমিকার পর জামা'আতে সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস পাঠ করে নেয়া যেতে পারে।

জামা'আতের গুরুত্ব

٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَأْتِىَ الصَّلٰوةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى الصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰى وَ اِنَّهُنَّ (اَىِ الصَّلَوَاتُ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ) مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ..... رواه مسلم

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা দেখছি যে, সেই সকল মুনাফিক যাদের মুনাফিকী জানাজানি হয়ে গিয়েছিল এবং রোগী ব্যক্তিরা ব্যতীত (মুসলমাদের) অন্য কেউ জামা'আতে অনুপস্থিত থাকে না, এমন কি যেসব রোগী দুই জনের কাঁধে ভর করে চলতে সক্ষম, তারাও জামা'আতে শরীক হত। তারপর তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে (দীন ও শরী'আতের) সত্যপথ প্রদর্শন করেছেন। এ সকল পথের একটি হলো, সেই মসজিদে সালাত আদায় করা যেখানে আযান দেওয়া হয়। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে হিদায়াতের সকল পথ বাতলে দিয়েছেন আর পাঁচ ওয়াক্তের সালাত মসজিদে আদায় কর এ সব হিদায়াতের পথসমূহের অন্যতম। তোমরা যদি এই সকল

সালাত (ঐ ব্যক্তির মত জামা'আত থেকে পৃথক) কর তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকেই ছেড়ে দিলে। তোমরা যদি নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন মূলত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পথ নির্দেশনা ও শিক্ষার অন্যতম দিক, যার মাধ্যমে উম্মাত সৎপথ লাভ করতে পারে। আলোচ্য হাদীসের শেষ দিকে তিনি বলেছেন ঃ জামা'আত ছেড়ে ঘরে সালাত আদায় করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদর্শ ত্যাগ করারই নামান্তর । তিনি আরো বলেছেন ঃ এই উম্মাতের প্রাথমিক পর্যায়ের লোকেরা যেহেতু আমাদের আদর্শ ছিলেন তাই মুনাফিক ও রোগের কারণে অপারগ ব্যক্তি ছাড়া সকল মুসলমানই জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ্র কোন কোন বান্দা অসুস্থ হলেও লোকের সাহায্যে জামা'আতে শরীক হতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর এই বর্ণনা থেকে একথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠে যে, তাঁর এবং সাধারণ সাহাবীদের দৃষ্টিতে জামা'আতে সালাত আদায় কর ওয়াজিব। যারা হাদীসে উদ্ধৃত " سُنَنُ الْهُدٰى " দ্বারা জামা'আতকে ফিক্হের পরিভাষায় 'সুন্নাত' বলেন তাঁরা সম্ভবত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর কথা সার্বিকভাবে তলিয়ে দেখেন নি। পরবর্তী হদীসসমূহ থেকে এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اٰخُذُ شُعْلاً مِنْ نَارٍ فَاُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ بَعْدَ - رواه البخارى ومسلم

৭৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার সালাতের চাইতে অধিক কষ্টকর সালাত নেই। অথচ এই দুই সালাতে কী ফযীলত রয়েছে তা যদি তারা জানত, তাহলে (অসুস্থ তার কারণে হেঁটে আসতে না পারলে) হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার উপস্থিত হত। নবী করীম ﷺ বলেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, (কোন

একদিন) মু'আয্‌যিনকে ইকামত দিতে বলি এবং কাউকে (আমার স্থলে) লোকদের ইমামতি করতে বলে আমি নিজে আগুনের একটি মশাল নিয়ে যারা সালাতে আসেনি (ভিতরে রেখে তাদের ঘরে) আগুন জ্বালিয়ে দেই, যারা (আযান শুনেও) সালাতের জন্য ঘর থেকে বেরোয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ আকবার! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় যে সকল লোক জামা'আতে সালাত আদায় করত না, তিনি তাদের বিরুদ্ধে কী কঠিন সতর্ক বাণী ও ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রভাবময়ী বাণী আরো স্পষ্টরূপে হযরত উসামা (রা) থেকে ইব্‌ন মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে। এতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"লোকদের জামা'আত বর্জন করা থেকে বিরত থাকা উচিত নতুবা অবশ্যই আমি তাদের ঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দেব।" (কানযুল উম্মাল, ইব্‌ন মাজার বরাতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সকল জামা'আত বর্জনকারীদের ব্যাপারে এহেন কঠিন ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তারা হয়ত আকীদার দিক থেকে ছিল মুনাফিক নতুবা কার্যের দিক থেকে ছিল (বে-আমল) মুনাফিক। জামা'আত বর্জন কারীদের সম্পর্কেই ছিল তাঁর এহেন ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। এই কথার ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক ইমাম (এ যাঁদের মধ্যে ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ও রয়েছেন) বলেন, সক্ষম ব্যক্তিদের জামা'আতে সালাত আদায় করা ফরয। অর্থাৎ তাঁদের মতে সালাত যেমন ফরয, তদ্রূপ জামা'আতে সালাত আদায়ও একটি পৃথক ফরয এবং জামা'আত বর্জনকারী একটি ফরযে আঈনের বর্জনকারী। কিন্তু প্রাজ্ঞ হানাফী আলিমগণ জামা'আত সংক্রান্ত সকল হাদীস সামনে রেখে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব এবং তার বর্জনকারী একজন গুনাহগার। উপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভাষণে মূলত এক ধরনের সতর্কবাণী ও ধমক দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٧٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيْ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِي صَلَّى - رواه أبوداؤد والدارالقطنى

৭৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মু'আয্‌যিনের আযানে শুনতে পায়, আর কোন উযর তাকে (জামা'আতে অংশগ্রহণ) থেকে বিরত না রাখে, (তা সত্ত্বেও যদি সে জামা'আতে শরীক না হয়ে তবে, তার সালাত কবুল হবে না। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন ঃ

উযর কি? তিনি বললেন জানমালের ক্ষতির আশংকা কিংবা রোগ ব্যাধি। (আবূ দাউদ ও দারু কুতনী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে সালাতের জামা'আত বর্জনকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন সতর্কবাণী ও ধমক উচ্চারিত হয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, উযূ যেমন সালাতের জন্য শর্ত, তেমনি জামা'আত ও (সালাত কবূলের জন্য শর্ত)। উযর ছাড়া সালাতের জামা'আত ত্যাগ জনিত কারণে সালাতই আদায় হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ইমামগণের মতে এহেন ব্যক্তির সালাত আদায় হয়ে যাবে, তবে তা হবে নিতান্ত অসম্পূর্ণ আদায়, তার সাওয়াবও হবে খুবই কম এবং আমলের যে উদ্দেশ্য– আল্লাহ্‌র বিশেষ সন্তোষ অর্জন তা থেকেও সে বঞ্চিত হবে । অধিকাংশ আলিমের মতে, এটাই হল সালাত কবূল না হওয়ার মর্ম। অন্যান্য হাদীসে যেখানে জামা'আতের সাথে এবং জামা'আত বিহীন সালাতের সাওয়াবের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের উল্লেখ রয়েছে তাতেও জমহুর আলিমদের অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। তবে এ কথা সত্য যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জামা'আত বর্জন মূলত রহমত ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া ও দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়ারই নামান্তর।

٧٦- عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ ثَلٰثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - رواه أحمد وأبوداؤد والنَّسَائى

৭৬. হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিন জন লোক ও অবস্থান করে অথচ সালাতের জামা'আত কায়েম করেন, তাদের শয়তান কাবু করে ফেলে। কাজেই জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ দলছুট একক বকরীকেই বাঘে ধরে খায়। (আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ কোথাও যদি তিন জন মুসল্লী থাকে, তাদেরও জামা'আতে সালাত আদায় কর উচিত। যদি তারা তা না করে তাহলে শয়তান অতি সহজেই তাদেরকে শিকারে পরিণত করবে।

জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত ও বরকত

٧٦- عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ ثَلٰثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ

بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - رواه أحمد وأبوداؤد والنَّسَائى

٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً- رواه البخارى ومسلم

৭৭. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জামা'আতে সালাত আদায় করার ফযীলত একাকী সালাত আদায় করার চাইতে সাতাশ গুণ বেশি। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের পর্থিব জগতে বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ক্ষেত্র মর্যাদায় যেমন পার্থক্য রয়েছে যার ভিত্তিতে বস্তুর উপকারিতা ও মূল্যায়নে পার্থক্য হয়ে থাকে,তেমনি আমালের মধ্যেও মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে, তার সবিস্তার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখনই কোন আমালের বিষয় এরূপ মন্তব্য করেন যে, অমুকে কাজের মুকাবিলায় অমুক কাজের এত গুণ অধিক মর্যাদা রয়েছে। যখন তিনি আল্লাহ্র তরফ থেকে তা জ্ঞাত হন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী "একাকী সালাত আদায় করার চাইতে জামা'আতে সালাত আদায়ে রয়েছে সাতাশ গুণ সাওয়াব বেশী"। বলার হাকীকত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি তা মু'মিনগণকে জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই প্রত্যেক মু'মিনের জামা'আতে সালাত আদায় করা উচিত। এই হাদীসের আলোকে একথাও জানা গেল যে, একাকী সালাত আদায়কারীর সালাত নিরর্থক নয় এতেও সালাত আদায় হবে। কিন্তু সাওয়াব ছাব্বিশ গুণ কম হবে। এটাও একটা বিরাট ক্ষতি এবং বড় ধরনের বঞ্চিত হওয়া।

(٧٨) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ - رواه الترمذى

৭৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য একাধারে চল্লিশ দিন তাক্বীরে উলার (প্রথম তাক্বীর) সাথে জামা'আতে সালাত আদায় করতে পারল তাকে দু'টি মুক্তির সনদ দেওয়া হয়- জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফিকী থেকে নিষ্কৃতি। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ একাধারে চল্লিশ দিন তাক্বীরে উলার সাথে সালাত আদায় করা আল্লাহ্র নিকট একটি প্রিয় কাজ এবং বান্দা তার একাজের মাধ্যমে এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, তার অন্তর নিফাকমুক্ত এবং এ এমনই একটি কাজ যার দ্বারা বান্দা জান্নাত লাভ করবে, কখনো জাহান্নামের আগুনের শিকার হবেনা। কাজেই কোন লোক যদি আন্তরিকতার সাথে দৃঢ়সংকল্প করে এবং সাহস রাখে, তবে আল্লাহ্র তাওফীকের আশা করা যায়। এটা কোন কঠিন কাজ নয়। এ হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, ধারাবাহিক চল্লিশ দিন ভাল কাজ করার মধ্যে বিশেষ কার্যকারিতা নিহিত রয়েছে।

জামা'আতের নিয়্যাতের মধ্যে জামা'আতের পূর্ণ সাওয়াব নিহিত

٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا ، لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا - رواه أبوداؤد والنسائى

৭৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ উত্তমরূপে (পূরো পাবন্দিসহ) উযূ করে, তারপর মসজিদে গিয়ে দেখে লোকের (জামা'আতের সাথে) সালাত আদায় করে নিয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তিকে জামা'আতে অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ সাওয়াব দিবেন। কিন্তু এতে তাদের সাওয়াব বিন্দুমাত্র কম হবে না। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের মর্ম হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি জামা'আতে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত এবং সতর্ক, সে যদি উত্তমরূপে উযূ করে নিজ অভ্যাস মত জামা'আতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য মসজিদে গিয়ে দেখে যে, জামা'আত হয়ে গেছে, আল্লাহ্ তাকে তার বিশুদ্ধ নিয়্যাতের কারণে জামা'আতের পূর্ণ সাওয়াব দিবেন। কারণ একথা পরিষ্কার যে, উক্ত ব্যক্তির অলসতা কিংবা অমনোযোগীভাব ইত্যাদির কারণে জামা'আত হারায় নি বরং সময় জ্ঞানে ভুল হওয়ায় বা অনুরূপ কোন কারণে জামা'আত থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যাতে তার কোন ত্রুটি ছিল না।

কোন্ অবস্থায় জামা'আতে সালাত আদায় করা জরুরী নয়

٨٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّ رِيْحٍ ثُمَّ قَالَ اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ

اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَّمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ - رواه البخارى ومسلم

৮০. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার প্রচণ্ড শীত ও প্রবল বাতাসের রাতে সালাতের আযান দিলেন। তারপর ঘোষণা দিলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও। এরপর তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হলে মু'আয্যিনকে একথা বলার নির্দেশ দিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে যে শীত ও বাতাসের রাতের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা প্রচণ্ড শীত ও ঝড়ো বাতাস বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে যদি এরূপ প্রবল বৃষ্টি হয় যাতে মসজিদে পর্যন্ত পৌঁছতে ভিজে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় অথবা রাস্তায় পানি, কাদা থাকে বা পথ পিচ্ছিল হয়ে যায় এমতাবস্থায়ও নিজ ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে। এসব অবস্থায় সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া জরুরী নয়।

٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يُعَجِّلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ - رواه البخارى ومسلم

৮১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো সামনে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়, ওদিকে (মসজিদে) সালাতের ইকামাতও শুরু হয়ে যায় তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নেবে। খাবার শেষ না করে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ভাষ্যকারগণ লিখেছেন, কারো যদি তীব্র ক্ষুধা অনুভূত হয় এবং সামনে খানা পরিবেশন করা হয় এমতাবস্থায় যদি সে খাবার গ্রহণ না করে সালাতে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তার মনে সালাতের মধ্যে খানার কথা স্মরণ হবে। এজন্য এহেন অবস্থায় শরী'আতের বিধানের অনিবার্য দাবি হলো প্রথমত খাবার শেষ করে তারপর সালাত আদায় করা।

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে কখনও কখনও আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতেন। তাঁর সামনে খানা পরিবেশন করা হচ্ছিল, ওদিকে সালাতেরও ইকামাত চলছিল।

এমতাবস্থায় তিনি আহার করে নিতেন অথচ ইমামের কিরা'আত তাঁর কানে ঝংকৃত হত। কিন্তু তিনি খাবার শেষ করে সালাত আদায় করে নিতেন। উল্লেখ্য, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) শরী'আত ও সুন্নাতের একজন অনন্য অনুসারী বরং প্রেমিক ছিলেন। তিনি একাজ মূলত (উপরে বর্ণিত হাদীসের আলোকেই করেছিলেন।

٨٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلٰوةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الاَخْبَثَانِ - رواه مسلم

৮২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, খানা সামনে আসার পর কোন সালাত নেই এবং পেশাব পায়খানার বেগ থাকা অবস্থায়ও কোন সালাত নেই। (মুসলিম)

٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَبْدَءْ بِالْخَلاَءِ - رواه الترمذى وروى مالك وأبوداؤد والنسائى نحوه

৮৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যখন সালাতের জামা'আত শুরু হয় এবং তোমাদের কারো পেশাব পায়খানার বেগ শুরু হয়, তখন তার পেশাব পায়খানা করে নেয়া উচিত।

(তিরমিযী, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, আবূ দাউদ ও নাসায়ী কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত হাদীসসমূহে প্রবল বাতাস, বৃষ্টি, প্রচণ্ড শীত, পানাহার এবং পেশাব পায়খানার বেগের সময় জামা'আতের সালাত আদায় করতে না পারায় একাকী সালাত আদায়ের যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এতে একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলাম মানুষের অপারগতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছে।

জামা'আতে সালাত আদায়কালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান

সালাতের যেহেতু সামষ্টিক দিক রয়েছে তাই এতে রয়েছে জামা'আতের ব্যবস্থা। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পথ নির্দেশ হচ্ছে এই যে, লোকেরা সালাত আদায়কালে যেন কাতার বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সালাতের মত সামষ্টিক ইবাদতে সারিবদ্ধভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পদ্ধতির কোন বিকল্প

নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারিগুলো পুরোপুরি সোজা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন, যাতে কেউ আগে-পিছে না দাঁড়ায়। প্রথমত প্রথম সারি পূরো করার পর পেছনের সারিসমূহ সোজা করে নিতে হবে।

বয়োজ্যেষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও প্রবীণদের সামনের সারিতে ইমামের কাছাকাছি স্থানে জায়গা দিতে হবে। ছোট শিশুদের পেছনে এবং নারীদেরকে পেছনে সর্বশেষ সারিতে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। ইমাম সাহেব সবার সামনে মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়াবেন। উল্লেখ্য, এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো, জামা'আতে মহান উদ্দেশ্য সফলতা ও পূর্ণতা বয়ে আনা এবং একে অধিক উপকারী ও প্রভাবময়ী করে তোলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এগুলো বাস্তবে করে দেখিয়েছেন, উম্মাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এর সাওয়াব বাতলে দিয়ে তা কার্যে পরিণত করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। এসব ব্যাপারে যারা বেপরোয়া ও উদাসীন তাদের তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এ ভূমিকার পর নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করা যাক।

কাতার সোজা করার গুরুত্ব এবং তাকিদ

٨٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُم فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اَقَامَةِ الصَّلٰوةِ - رواه البخارى

৮৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাতারগুলো সোজা কর। কারণ কাতার সোজা ও সমান করা সালাতকে সুষ্ঠুভাবে আদায় করার অর্ন্তভূক্ত । (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ইকামাতে সালাত, যে বিষয়ে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা মুসলমানদের উপর অন্যতম ফরয, এর পূর্ণতা বিধানের জন্য যে সকল শর্তারোপ করা হয়েছে তন্মধ্যে জামা'আতে দাঁড়ানোর সময় কাতার সোজা ও সমান করার বিষয়টি অন্যতম। সুনানে আবূ দাউদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন সালাতের ইমামতি করার জন্য দাঁড়াতেন তখন প্রথমে ডানদিকে ফিরে বলতেন ঃ তোমরা কাতার সোজা ও সমান করে দাঁড়াও। অনুরূপ বামদিকে ফিরে বলতেন ঃ তোমরা কাতার সোজা ও সমান করে নাও। এই হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে সালাতে দাঁড়ানোর সময় প্রায়ই এ বিষয়ে তাকিদ দিতেন।

٨٥- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ سُفُوْفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يُكَبِّرَ فَرَاٰى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ — رواه مسلم

৮৫. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করতেন যেন তা দিয়ে তীর সোজা করবেন। এভাবে করতে করতে এক সময় তিনি দেখলেন, আমরা একাজটি (কিভাবে সোজা দাঁড়াতে হয়) শিখে গেছি। তারপর তিনি একদিন বেরিয়ে এসে নিজের জায়গায় দাঁড়ালেন। এমনকি তিনি তাক্বীর বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার বুক কাতারের বাইরে বের হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র বান্দারা কাতার সোজা করে নাও, অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের চেহারার মধ্যে বিরোধীতা সৃষ্টি করে দিবেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ "এমন কি তিনি কাতার দিয়ে তীর সোজা করে নিবেন" এর তাৎপর্য বুঝার জন্য প্রথমে জেনে নেয়া আবশ্যক যে, আরবরা জন্তু শিকার কিংবা রণাঙ্গনে ব্যবহারের লক্ষ্যে যে তীর তৈরি করত তা পূর্ণ সোজা ও সমান করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাত। এজন্য কোন সোজা বস্তুর প্রশংসা করতে গিয়ে বলত, বস্তুটি এমন সোজা এটা দিয়ে সোজা করা যায়। অর্থাৎ তা তীর সোজা ও সমান করার মাপকাঠিরূপে স্বীকৃত। মোদ্দাকথা, আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত নু'মান ইব্ন বাশীরের বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো এমনভাবে সোজা করতেন যাতে আমরা এক সূতা পরিমাণ আগে কিংবা পিছেনা দাঁড়াই। দীর্ঘদিন ধরাবাহিকভাবে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের পর তাঁর এ বিশ্বাস জন্মায় যে, আমরা বিষয়টি পুরোপুরি কার্যে পরিণত করতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু এরপর যখন তিনি একদিন এক ব্যক্তির মধ্যে এরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করেন তখন অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ ! আমি এ বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, সালাতের কাতারগুলো সোজা ও সমান করার ব্যাপারে যদি তোমাদের মধ্যে বে-পরোয়াভাব ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে থাকে, তবে আল্লাহ্ শাস্তিস্বরূপ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। অর্থাৎ তোমাদের ঐক্য ও সংহতি তিনি নষ্ট করে দিবেন। ফলে তোমরা কলহ-বিবাদে

জড়িয়ে পড়বে যা দুনিয়ায় উম্মাতের জন্য এক ধরনের শাস্তি। সালাতের কাতারসমূহ সোজা করার ক্ষেত্রে ত্রুটির ও অসচেতনার ফলে যে পারস্পরিক সংঘাত ও কলহ-বিবাদ অনিবার্য এবং এ ব্যাপারে যে হুশিয়ারী ও সতর্কবাণী সম্বলিত বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। নিঃসন্দেহে রূপ ত্রুটি ও শাস্তির মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। আফসোস! অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়েও বিশেষ করে কোন কোন এলাকার মুসল্লীদের মধ্যে এ ত্রুটি সাধারণ রূপ নিয়েছে।

٨٦- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبِنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُولُوْاالاَرْحَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

رواه مسلم

৮৬. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে (আদায় পূর্বক্ষণে) আমাদের কাঁধে হাত দিয়ে বলতেনঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, আগে-পিছে হয়ে যেও না, অন্যথায় তোমাদের মনের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিবে। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের যেন আমার নিকটবর্তী থাকে। তারপর তারা থাকবে যারা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে তাদের কাছাকাছি। তারপর তারা যারা তাদের কাছাকাছি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক কাতারসমূহ সোজা করা ছাড়াও কাতারসমূহে দাঁড়ানো লোকদের পর্যায়ক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো এই যে, আমার কাছে ঐ সকল লোক দাঁড়াবে আল্লাহ্ যাদের দীনের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তারপর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দিক থেকে যারা তাদের কাছাকাছি তারা থাকবে। তারপর থাকবে যারা তাদের কাছাকাছি। বলাবাহুল্য, এ বিন্যাস পদ্ধতি মানুষের সহজাত অভ্যাসের অনিবার্য দাবি। আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ও দাবি এই যে, উত্তম ব্যক্তিবর্গ মর্যাদার অনুযায়ী সামনে ও নিকটে অবস্থান গ্রহণ করবেন।

٨٧- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا اِذَاقُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ فَاِذَاسْتَوَيْنَا كَبَّرَ - رواه أبو داؤد

৮৭. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়াতেন তখন আমাদের কাতারগুলো সোজা ও সমান করে নিতেন। এরপর আমরা সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি (সালাতের) তাক্বীর বলতেন। (আবূ দাঊদ)

সর্বাগ্রে প্রথম কাতার পুরা করা

٨٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِن نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ - رواه أبوداؤد

৮৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা প্রথম কাতার পুরা কর, তারপর এর পরের সারি। যদি কোন কমতি থাকে তাহলে সেটা হবে শেষ সারিতে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ মুসল্লীরা যখন সালাতে দাঁড়ায় প্রথমে তাদের প্রথম কাতার, তারপর পর্যায়ক্রমে খালি স্থান থাকা পর্যন্ত কাতারসমূহ পুরা করে নিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সামনের সারিতে ফাঁকা জায়গা থাকবে ততক্ষণে পেছনে দাঁড়াবে না। এর ফল এই দাঁড়াবে যে, প্রথম সারিগুলো পূরা হয়ে যাবে, কমতি শুধু শেষ সারিতে থাকবে।

প্রথম কাতারের ফযীলত

٨٩- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الاَوَّلِ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِىْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الاَوَّلِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِىْ قَالَ وَعَلَى الثَّانِىْ- رواه أحمد

৮৯. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রথম সারির ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ এবং ফিরিশ্তাকুল রহমতের দু'আ করেন। সাহাবা কিরাম বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় সারির জন্য ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম সারির ব্যক্তিদের প্রতি রহমত বর্ষণ এবং ফিরিশ্তাগণ রহমতের দু'আ করেন। তাঁরা আবার বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় সারির জন্য? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্

তা'আলা প্রথম সারির ব্যক্তিদের প্রতি রহমত বর্ষণ এবং ফিরিশ্তাগণ রহমতের দু'আ করেন। তাঁরা আবার বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় সারির জন্য? তিনি বললেন ঃ দ্বিতীয় সারির জন্যও। (আহ্মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্র বিশেষ রহমত এবং ফিরিশতাদের দু'আ বিশেষত প্রথম সারির লোকদের জন্য বরাদ্ধ। দ্বিতীয় সারির লোকেরা এ সকল ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হলেও মর্যাদার দিক থেকে অনেক পেছনে। মোদ্দাকথা, আমাদের দৃষ্টিতে প্রথম ও দ্বিতীয় সারির মধ্যে রয়েছে যৎসামান্য ব্যবধান, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার দিক থেকে দুই সারির মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। এজন্য আল্লাহ্র রহমত প্রত্যাশীদের যথাসম্ভব প্রথম সারিতে স্থান নেয়ার চেষ্টা করা উচিত। এর অনিবার্য দাবি হচ্ছে, প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে উপস্থিত হওয়া। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানত প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে, তাহলে তা অর্জন করার জন্য তারা প্রয়োজন হলে অবশ্যই লটারী করত। আল্লাহ্ এসব হাকীকতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের তাওফীক দিন। আমীন!

কাতারের বিন্যাস পদ্ধতি

٩٠- عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الاَشْعَرِىِّ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلٰوتَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ اُمَّتِىْ -رواه أبو داؤد

৯০. হযরত আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সালাতের বিষয়ে অবহিত করব না? এরপর তিনি বলেন, সালাত আদায়ের প্রথমে তিনি পুরুষদের, তারপর বালকদের সারি বিন্যাস করতেন। এরপর তিনি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি বলতেন ঃ এটাই আমার উম্মাতের সালাতের বিন্যাস পদ্ধতি।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে সঠিক ও সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, প্রথম হবে পুরুষদের কাতার তার পেছনে হবে শিশুদের কাতার, পরবর্তী হাদীস থেকে আরো জানা যাবে যে, জামা'আতে যদি মহিলারা অংশগ্রহণ করেন তবে তারা শিশুদের পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন।

ইমাম মাঝিমাঝি স্থানে দাঁড়াবেন

٩١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَسَّطُوْا الاِمَامَ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ - رواه أبو داؤد

৯১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা ইমামকে (সারির) মাঝামাঝি স্থানে দাঁড় করাও এবং সারির মধ্যকার ফাঁকা জায়গাসমূহ বন্ধ করে নাও। (আবূ দাঊদ)

মুক্তাদী একজন কিংবা দু'জন হলে কিভাবে দাঁড়াবে?

٩٢- عَنْ جَابِرٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىْ فَجِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدَيْنَا فَدَفَعَنَا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ - رواه مسلم

৯২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাতে দাঁড়ালেন। ইতোমধ্যে আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে আমাকে তাঁর পিছন দিয়ে নিয়ে এসে ডানে দাঁড় করান। তারপর জাব্বার ইব্ন সাখর আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর বামপাশে দাঁড়িয়ে যান। এমতাবস্থায় তিনি আমাদের উভয়ের হাত ধরে পিছনে দাঁড় করান। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইমামের সাথে যদি কেবলমাত্র একজন মুক্তাদী থাকে, তবে সে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। যদি সে ভুলবশতঃ বামদিকে দাঁড়ায়, তবে ইমাম তাকে ডান দিকে এনে দাঁড় করিয়ে দিবেন। তারপর যদি আরও একজন এসে যোগ দেয়, তবে ইমামকে আগে যেয়ে তাদেরকে পিছনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।

٩٣- عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلٰوةَ - رواه الترمذى وأبوداؤد

৯৩. হযরত ওয়াবিসা ইব্ন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায় করতে

দেখেন। তখন তিনি তাকে পুনর্বার সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যাঃ কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা কোন অবস্থায়ই জামা'আত ও সামষ্টিক সালাতের জন্য শোভন নয়। এজন্য শরী'আতে তা মাকরূহ এবং অপসন্দনীয় যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে পুনর্বার সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জ্ঞাতব্যঃ কোন ব্যক্তি যদি এসে দেখতে পায় যে, মসজিদে তার সামনের কাতার পুরা হয়ে গেছে এবং তার সাথে দাঁড়ানোর জন্য যদি কোন লোক না থাকে তবে একজন অভিজ্ঞ মুসল্লীকে পেছনে টেনে এনে দু'জনে একত্রে দাঁড়াবে। তবে শর্ত হলো, ঐ ব্যক্তি যেন সহজেই পেছনে চলে আসে। এরূপ লোক না পাওয়া গেলে একাকী দাঁড়িয়ে যাবে এবং এ অবস্থাটি আল্লাহ্‌র কাছে উযর হিসেবে গণ্য হবে।

নারীদেরকে পুরুষের এমনকি বালকদের পেছনে দাঁড়াতে হবে

٩٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا - رواه مسلم

৯৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি এবং (আমার ভাই) ইয়াতীম আমাদের ঘরে নবী করীম ﷺ এর পেছনে সালাত আদায় করি। আর (আমাদের মা) উম্মু সুলায়ম (রা) আমাদের পেছনে (সালাতে) দাঁড়িয়ে ছিলেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, জামা'আতে যদি একজন মহিলাও অংশগ্রহণ করে, তবুও তাকে পুরুষ ও বালকদের পেছনে দাঁড়াতে হবে। এমনকি সামনের কাতারে দাঁড়ানোর স্থান থাকলেও। পৃথকভাবে একাকী পেছনে দাঁড়াতে হবে। মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং উম্মু সুলায়মকে পেছনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

পূর্বে উল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, পেছনের সারিতে একাকী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা কত অপসন্দনীয় কাজ। কিন্তু পুরুষ তো দূরের কথা বালকদের সাথে মহিলাদের একত্রে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শরী'আতের দৃষ্টিতে আরও অপসন্দনীয় কাজ এবং বিপদজ্জনকও বটে। সুতরাং একজন মহিলা হলেও তাকে কেবল অনুমতি নয় বরং এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন সর্বশেষ কাতারের পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে।

ইমামত

একথা সর্বজনবিদিত যে, দীনে ইসলামে সালাতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ আমল এবং এর মর্যাদা ঐরূপ যেমন মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের স্থান। এজন্য সালাতের ইমামতি বিরাট মর্যাদা ও দায়িত্বশীলতার ব্যবহার এবং এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক প্রকার প্রতিনিধিত্বও বটে। কাজেই ইমামতির জন্য এমন লোক মনোনীত করা প্রয়োজন, যিনি অন্যান্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত মর্যাদাবান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলে বিবেচিত এবং যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সর্বাধিক নিকট সম্পর্ক রাখেন। কারণ তিনি দীনের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অধিক খিদ্‌মত আঞ্জাম দিয়েছেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উত্তরাধিকারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল কুরআনুল করীম, তাই যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুরআন মাজীদের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, তা মুখস্থ করে অন্তরে রেখে দেয় এবং এর দাওয়াতও সমীহত বুঝে এবং নিজে তা কার্যে পরিণত করে সে-ই প্রকৃত অর্থে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উত্তরাধিকারের বিরাট অংশ লাভ করেছে। সব গুণাবলীতে পিছিয়ে থাকা লোকের তুলনায় ঐ ব্যক্তি ইমামতির জন্য অধিকতর যোগ্য বিবেচিত হবেন। যদি এক্ষেত্রে সকল মুসল্লী একই মানের হন, তবে যিনি সুন্নাতের ক্ষেত্রে অধিক পারদর্শী তিনি ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। যদি এক্ষেত্রেও সবাই সমান হন, তবে যিনি অধিক আল্লাহ্ ভীরু এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী তিনি ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। যদি এ ক্ষেত্রেও সবাই সমান হন, তবে যিনি অধিক আল্লাহ্ ভীরু এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী তিনি ইমামতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন। এ বিষয়ে যদি সবাই একই মানের হন, হবে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। কারণ বয়োজ্যেষ্ঠতাও মর্যাদা নির্ণয়ের অন্যতম স্বীকৃত মাপকাঠি।

মোটকথা, ইমামতির জন্য উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ সুস্থ বিবেকের ও প্রজ্ঞার দাবি এবং এ-ই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শিক্ষার দিক নির্দেশ।

ইমামতির ক্ষেত্রে উপযুক্ততার বিন্যাস

٩٥- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ

هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمَهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ – رواه مسلم ؛

৯৫. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। সেই ব্যক্তিই লোকদের ইমামতি করবে যে আল্লাহ্র কিতাব পাঠে সর্বাধিক জ্ঞাত। যদি কিরা'আত পাঠে সবাই সমান হয় , তবে যে আগে হিজরত করেছে সে ইমামতি করবে। যদি হিজরতের ক্ষেত্রেও সবাই সমান হয় , তবে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে ইমামতি করবে। তোমাদের কেউ অন্য কারো কর্তৃত্বের স্থলে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে তার আসনে বসবে না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উদ্ধৃত اقرآهم لكتاب الله এর অর্থ হলে , "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব পাঠে সর্বাধিক জ্ঞাত। " কিন্তু কেবল কুরআন হিফ্য করা অধিক পাঠ করা এর উদ্দেশ্যে নয়। বরং এর উদ্দেশ্যে, কুরআন হিফযের সাথে সাথে কুরআনের গভীর জ্ঞান অর্জন এবং কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে 'কুর্‌রা' উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন । তাই হাদীসের মর্ম হল যে ব্যক্তি কুরআনের যত অধিক জ্ঞানের অধিকারী হবে সেই ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে যারা এ সব গুণে গুণান্বিত ছিলেন তাঁরাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উত্তরাধিকারী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরূপে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর সুন্নাহ্ এবং শরী'আতের জ্ঞান ছিল মর্যাদার অন্যতম মাপকাঠি। (সেকালে কুরআন-সুন্নাহয় যার দক্ষতা ছিল তিনি তার আমালকারীও ছিলেন, তার পক্ষে আমালশূণ্য হওয়ার বিষয়টি চিন্তাও করা যেত না।)

নবী যুগে মর্যাদার তৃতীয় মাপকাঠি ছিল হিজরাতের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হওয়ার বিষয়টি। তাই হাদীসে সেটিকে তৃতীয় স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এমন সময় এসে গেল যখন তাঁদের অস্তিত্ব বাকি থাকল না। তাই ফিক্হবিদগণ তাক্ওয়া পরহিযগারীকে ও মর্যাদার মানদণ্ড স্থির করেছেন এবং প্রাধান্য দিয়েছেন যা সত্যিকারভাবে তৃতীয় মাপকাঠি হওয়ার দাবি রাখে।

আলোচ্য হাদীসে প্রাধান্য প্রাপ্তির চতুর্থ মানদণ্ড হচ্ছে, বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া । তাই বলা হয়েছে, উপরে বর্ণিত তিনটি গুণের ব্যাপারে যদি সবাই সমান হয়, তবে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ,তিনি হবেন ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য।

হাদীসের শেষাংশে দু'টি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ১. যদি কেউ কারো কর্তৃত্বের এলাকায় গমন করে , তবে সে যেন ইমামতি না করে বরং তার মুক্তাদী হিসেবে সালাত আদায় করে। তবে ঐ ব্যক্তি নিজে যদি তাকে বাধ্য করেন, তবে ভিন্ন কথা, ২. যদি কেউ কারো ঘরে যায়, তবে সে যেন তার বসার নির্দিষ্ট আসনে না বসে । অবশ্য সে যদি বসায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। এ দু'টি নির্দেশনার রহস্য ও কার্যকারিতা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার।

নিজেদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করবে

٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْا اَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَاِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ – رواه الدار قطنى والبيهقى (كنز العمال)

৯৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের ইমাম নিয়োগ করবে । কারণ তিনি হবেন তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রতিনিধি। (দারু কুতনী ও বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ এ কথা পরিষ্কার যে ইমাম তার অধীনস্থ লোকদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দারবারে প্রতিনিধিত্ব করেন। জামা'আত যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, তাই এ পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে একজন উত্তম ব্যক্তি নির্বাচন করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যত দিন দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন, ততদিন ইমামতি করেছেন এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কে ইমামতি করার জন্য নাম ধরে নির্দেশ দেন।

হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) বর্ণিত হাদীসে ইমামতির হক্দার হবার ব্যাপারে যে বিস্তারিত পর্যায়ক্রমা বাতলান হয়েছে তার উদ্দেশ্যে হচ্ছে, জামা'আতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মানোনীত করা। কোন না উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اِقْرَاهم لكتاب الله ، اعلمهم بالسنة

(তোমাদের মধ্যে যে কুরআন তারপর সুন্নাহ্র ব্যাপারে পারদর্শী সে ব্যক্তি ইমামতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে)

এ টি আসলে ধর্মীয় দিক থেকে মর্যাদার মাপাকাঠির ব্যাখ্যা মাত্র। আফসোস! বর্তমান সময়ে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়। ফলে উম্মাতের পুরো কাঠামো তছনছ হয়ে গেছে।

ইমামের দায়িত্ব ও জবাদিহিতা

٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُوْلٌ لَمَا ضَمِنَ وَاِنْ اَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الاَجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ - رواه الطبرانى فى الاسط ركنز العمال)

৯৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাওমের ইমাম নিযুক্ত হয়, সে যেন আল্লাহ্কে ভয় করে এবং যেন জেনে রাখে যে, সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। যদি সে তার দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়, তবে তার পশ্চাদবর্তী মুসল্লীর সমপরিমাণ সাওয়াব সে লাভ করবে। কিন্তু তাদের সাওয়াব সামান্যও কম করা হবে না। তবে সালাতে যদি কোন ত্রুটি হয়, তবে তার দায় দায়িত্ব তারই। (তাবারানীর মু'জাম আওসাত গ্রন্থ সূত্র- কানযুল উম্মাল)

ইমাম কর্তৃক মুক্তাদীর প্রতি লক্ষ্য রাখা

٩٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ - رواه البخارى ومسلم

৯৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন লোকদের সালাতের ইমামতি করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ (বেশি দীর্ঘ না) করে। কেননা তাদের মাঝে অসুস্থ, দর্বল ও বয়োবৃদ্ধ লোক রয়েছে (যাদের জন্য দীর্ঘ সালাত কষ্টদায়ক হতে পারে)। তবে যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন সাহাবী তাদের মহল্লার মসজিদে সালাতের ইমামতি করতেন। ইবাদতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকায় তারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। ফলে অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধ মুক্তাকীদের ভীষণ কষ্ট হত, এই ভুল সংশোধনের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ের উপর ভাষণ দেন। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল ইমাম যেন তার অসুস্থ , দুর্বল ও বৃদ্ধ মুক্তাদীদের

প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং সালাতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ না করেন। তবে এর দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, ইমাম সর্বদা প্রত্যেক সালাতে ছোট ছোট সূরা পাঠ করবে এবং রুকু সিজ্দায় তিনবারের বেশি তাসবীহ্ পাঠ করবে না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ ভারসাম্য রক্ষা করে সালাত আদায় করতেন উম্মাতের জন্য তাই হচ্ছে প্রকৃত মাপকাঠি ও শ্রেষ্ঠ নমূনা। এ আলোকেই তাঁর দিকনির্দেশের মূল্যায়ন করতে হবে। সালাত আদায়ের সবিস্তার বিবরণও কিরা'আতের পরিমাণ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীসসমূহ ইনশাআল্লাহ পরে বর্ণিত হবে।

٩٩- عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْمَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَ تَأَخَّرُ عَنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَاالْحَاجَةِ - رواه البخارى ومسلم

৯৯. হযরত কায়স ইব্ন আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবূ মাসঊদ (রা) জানিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! আমি অমুকের কারণে ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি (এবং বাধ্য হয়ে একাকী সালাত আদায় করি) তিনি জামা'আতে সালাতকে খুব দীর্ঘ করেন। আবূ মাসঊদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ভাষণ দিতে যেয়ে সে দিনের ন্যায় এত বেশী ক্রুদ্ধ হতে আর কখনো দেখি নি। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝে (ভুল পদ্ধতির কারণে আল্লাহ্র বান্দাদের) ঘৃণা উদ্রেককারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে, সে যেন সালাত সংক্ষেপ করে (অতিরিক্ত দীর্ঘ না করে)। কেননা তাদের মাঝে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমান্দ লোকও থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে দীর্ঘ সালাত আদায় করার যে অভিযোগ তা মূলত হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সম্পর্কেই করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় একাধিক ঘটনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। হযরত মু'আয (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি সাধারণত ইশার সালাত দীর্ঘ করে আদায় করতেন। একদিন তিনি যথারীতি বিলম্বে সালাত শুরু করেন এবং

তাতে সূরা বাকারা পাঠ শুরু করেন। সাহাবীদের মধ্যে একজন (সারাদিনের ক্লান্তির কারণে) নিয়্যাত ছেড়ে দিয়ে একাকী সালাত আদায় করেন, তারপর বাড়ী চলে যান। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট পৌঁছে। তিনি মু'আয (রা) কে ধমক দিয়ে বললেন ঃ "হে মু'আয! তুমি লোকদের ফিত্নার কারণ হতে চাও এবং তাদেরকে ফিত্নার শিকারে পরিণত করতে চাও? এ হাদীসের শেষাংশে আছে তিনি তাকে বললেন ঃ "তুমি সূরা আশ্ শাম্স, আল-লায়ল, আদ্-দুহা এবং সূরা আ'লা পাঠ করবে।"

١٠٠-عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَدْخُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلٰوتِىْ مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهٖ مِنْ بُكَائِهٖ - رواه البخارى

১০০. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি অনেক সময় দীর্ঘ সালাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই, কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে সালাত সংক্ষেপ করি। কারণ শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর এ বাণীর মর্ম হচ্ছে সালাত আদায়ের সময় শিশুর কান্নার শব্দ তাঁর কানে পৌঁছলে তিনি এই খেয়ালে সালাত সংক্ষেপ করতেন যাতে জামা'আতে শরীক মহিলারা কষ্টে নিঃপতিত না হয়।

١٠١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَلٰوةً وَلَا اَتَمَّ صَلٰوةً مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَاِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ اَنْ تُفْتَنَ اُمُّهٗ - رواه البخارى ومسلم

১০১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ এর চাইতে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোঁন ইমামের পেছনে কখনো আদায় করি নি। আর তা এজন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের অস্থির হয়ে পড়ার (ও তার সালাত নষ্ট হওয়ার) আশংকায় সংক্ষেপ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ একজন ইমামের বিশুদ্ধ মাপকাঠি ও পথ নির্দেশিকামূলক নীতি এই হওয়া উচিত যে, তার সালাত হবে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ তিনি যাবতীয় রুক্ন-শর্ত এবং সুন্নাত মুতাবিক সালাত আদায় করবেন। এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে।

মুক্তাদীর প্রতি নির্দেশক

١٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُبَادِرُوْا الاِمَامَ اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ وَلَا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - رواه البخارى

১০২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ইমামের থেকে আগে বেড়ে যেও না (বরং তার অনুগামী হবে) সে তাক্বীর বললে তোমরাও তাক্বীর বলবে। সে 'ওয়ালাদ্দাল্লীন' বললে তোমরা 'আমীন' বলবে। সে রুকূ করলে তোমরা রুকূ করবে। সে 'সামি আল্লাহ্ লিমান হামিদা' বললে তোমরা 'আল্লাহুম্মা রাব্বান্না লাকাল হামদ' বলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সালাতের সকল কাজে ইমামের অনুসরণে মুক্তাদী পশ্চাদ্বর্তী থাকবে এবং কোন কাজে ইমামের অগ্রবর্তী হবে না।

মুসনাদে বায্যারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সিজ্দা থেকে মাথা উঠায়, তার ললাট প্রকারান্তরে শয়তানের হাতে থাকে এবং শয়তানই তাকে এরূপ করায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বুখারী ও মুসলিমে এও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে রুকূ অথবা সিজ্দা থেকে মাথা উঠায় তার জন্য এ আশংকা রয়েছে যে, তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা পানাহ দিন।

١٠٣- عَنْ عَلِىٍّ وَمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ وَالاِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الاِمَامُ - رواه الترمذى

১০৩. হযরত আলী ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সালাত আদায় করতে এসে ইমামকে কোন এক অবস্থায় পেলে। ইমাম যেরূপ করে সেও যেন তদ্রুপ করে। (তাকে রুকূ, সিজ্দা ইত্যাদি অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় তার সাথে সালাতে অংশগ্রহণ করবে)। (তিরমিযী)

١٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهُ شَيْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ - رواه أبوداؤد

১০৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যদি সালাতে এসে আমাদেরকে সিজ্‌দারত পাও, তবে সিজ্‌দা করে নিবে কিন্তু তা (রাকা'আত হিসেবে) গণনা করবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) রুকূ পেল সে সালাতের (ঐ রাক'আত) পেল। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে শরীক হয় এবং রুকূ পায়, তবে সে যেন এক রাকা'আত সালাত পেল। পক্ষান্তরে সিজ্‌দার পেলে আল্লাহ্ তার পূর্ণ সাওয়াব দিবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সিজ্‌দা (এক রাক'আত) হিসেবে গণ্য হবে না।

সালাত কীরূপে আদায় করবে?

١٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الَّتِىْ بَعْدَهَا عَلِّمْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِى صَلٰوتِكَ كُلِّهَا - رواه البخارى ومسلم

১০৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল আর তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক প্রান্তে বসা ছিলেন। লোকটি সালাত আদায় করল। তারপর এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তার সালামের

জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি চলে যাও এবং সালাত আদায় করে এসো, কেননা তুমি (সঠিকভাবে) সালাত আদায় করনি। লোকটি চলে গেল এবং সালাত আদায় করল। এরপর এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি যাও এবং পুনর্বার সালাত আদায় করে এসো, কেননা তুমি তো সঠিকভাবে সালাত আদায় করনি। তৃতীয়বার অথবা এর পরের বার লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কিভাবে সালাত আদায় করব সে বিষয়ে আমাকে অবহিত করুন (কেননা আমি যেভাবে জানি, যেভাবেও কয়েকবার আদায় করেছি) । তিনি বললেন ঃ তুমি সালাতে দাঁড়াবার প্রাক্কালে উত্তমভাবে উযূ করে নিবে। এরপর কিব্‌লামুখী হয়ে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলে সালাত শুরু করবে। এরপর কুরআন থেকে যতটুকু তোমার পক্ষে সহজ ততটুকু পাঠ করবে (কোন কোন বর্ণনায় আছে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং এর সাথে যা ইচ্ছা পাঠ করবে) তারপর রুকূ করবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ আদায় করবে। এরপর রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজ্‌দা করবে যাতে সিজ্‌দার প্রশান্তি আসে। এরপর সিজ্‌দা থেকে উঠে স্থিরভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজ্‌দায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজ্‌দা করবে। অন্য বর্ণনায় আছে, তারপর রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর পুরা সালাত এভাবে (রুকূ, সিজ্‌দা, কাওমা, জালসাসহ সব রকম ধীরস্থিরভাবে) আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হচ্ছেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত রিফয়া ইব্‌ন রাফি (রা) এর ভাই খাল্লাদ ইব্‌ন রাফি (রা)। সুনানে নাসায়ীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি মসজিদে এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন। কোন কোন ভাষ্যকার লিখেন, সম্ভবত এই দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত ছিল। কিন্তু তিনি এত তাড়াতাড়ি সালাত আদায় করেন যে, রুকু ও সিজ্‌দা যেরূপ ধীরস্থিরভাবে আদায় করা উচিত ছিল তিনি ঠিক সেভাবে আদায় করেন নি। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "তুমি যথাযথভাবে সালাত আদায় করনি।" কাজেই তিনি পুনর্বার সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন।

তিনি প্রথমবারেই পরিষ্কার করে একথা বলেন্ নি যে. "তোমার সালাতে এই ভুল হয়েছে এবং তুমি এভাবে সালাত আদায় কর।" বরং তিনি তৃতীয় কিংবা চতুর্থবারে জিজ্ঞাসার জবাবে তার ভুল সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, প্রত্যেক জ্ঞানবানই জানে যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের এই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। কাউকে যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত এই পন্থায় কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে পুরা জীবনেও সে তা ভুলবে না এবং অপরাপর লোকের মধ্যেও এর ব্যাপক

চর্চা হবে। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রুকূ,দাঁড়ানো ও সিজ্‌দা অবস্থায় কী পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে তিনি দিক নির্দেশনা দেন নি, এমনকি শেষ বৈঠক, তাশহ্‌হুদ ও সালামের বিষয়েও তিনি উল্লেখ করেন নি। এ বিষয়ে তিনি হয়ত ঐ ব্যক্তির জানা থাকায় পূণর্ব্যক্ত করেন নি। তবে বিশেষত তার যে ভুল পরিলক্ষিত হয়েছিল তা ছিল মূলত রুকূ, সিজ্‌দা ও ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায়ের বিষয়ে। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধনের নির্দেশ দেন।

হাদীসের শেষ অংশ নিয়ে বর্ণনাকারীদের মধ্যে খানিকটা দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, দ্বিতীয় সিজ্‌দা থেকে তাকে উঠার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ "তুমি উঠ এবং ধীরস্থিরভাবে বসো।" অন্যান্য বর্ণনায় আছে, তারপর তুমি উঠ এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও।" এ দু'টি বর্ণনাই ইমাম বুখারী (র) স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। প্রথম তৃতীয় রাক'আতে দুই সিজ্‌দার পর দাঁড়ানোর পূর্বে কিছুক্ষণ বসার জাল্‌সায়ে ইস্তিরাহাত বা আরামের বৈঠকের পক্ষে যে সব আলিম পোষণ করেন তাঁরা প্রথম রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞগণ দ্বিতীয় বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তবে এই হাদীসের বিশেষ দিক নির্দেশনা হচ্ছে এই যে, পূর্ণ সালাত ধীরস্থিরভাবে আদায় করা উচিত। কেউ যদি এমন তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করে যে, সালাতে তার রুকনসমূহ পুরোপুরি আদায় না হয় উদাহরণস্বরূপ রুকূ-সিজ্‌দায় শুধু উঠা-বসা এবং যতক্ষণ বিরতি প্রয়োজন তা না হয়, তবে এ ধরনের সালাত অগ্রহণযোগ্য এবং তা পুনর্বার আদায় করা ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে সালাত আদায় করতেন ?

١٠٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَأَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذَالِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ

يَنْهٰى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهٰى اَنْ يَّفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ بِالتَّسْلِيْمِ - رواه مسلم

১০৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীর দ্বারা সালাত এবং আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) দ্বারা কিরা'আত আরম্ভ করতেন। যখন রুকূ' করতেন তখন তাঁর মাথা মুবারক উঠিয়েও রাখতেন না, ঝুঁকিয়েও রাখতেন না বরং মাঝামাঝি রাখতেন। আর যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজ্‌দায় যেতেন না। তিনি প্রতি দুই রাক'আতে 'আত-তাহিয়্যাতু' (তাশাহুদ) পাঠ করতেন। তখন তিনি বাম পা বিছিয়ে রাখতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি শয়তানের মত নিতম্বের উপর বসতে নিষেধ করতেন। পুরুষকে তার (কনুই পর্যন্ত) দুই হাত হিংস্র জন্তুর মত বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি সালামের দ্বারা সালাত শেষ করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। তাই এর জন্য দাঁড়ানো, বসা, রুকূ-সিজ্‌দা ইত্যাদির নিয়ম নির্দিষ্ট করা হয়েছে যা এ ইবাদাতে পূর্ণতার সর্বোত্তম চিত্র। বিশেষতঃ অহমিকা, বে-পরোয়াভাব, দৃষ্টিকটু এবং অশোভন হিংস্র জন্তুর সাথে সাদৃশ্য ইত্যাকার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানুষকে কুকুর, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি হিংস জন্তুর, ন্যায় নিতম্বের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে 'শয়তানের ন্যায়' এবং অন্য হাদীসে কুকুরের ন্যায় বসতে নিষেধ করেছেন। ভাষ্যকার ও ফিক্‌হবিদগণ এর দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অধমের (গ্রন্থকার) নিকট দু' পায়ের পাঞ্জা খাড়া রেখে গোড়ালীর উপর বসা পদ্ধতিটি প্রাধান্য পাবার দাবি রাখে। বলাবাহুল্য, এ অবস্থাটি কিছুটা অহমিকাবোধ ও তাড়াহুড়ার লক্ষণ বটে। এ পদ্ধতিতে কেবল হাঁটু ও হাতের তালু মাটিতে লাগে। কুকুর, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী নিতম্বের উপর ভর করে বসে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে এরূপ বসতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত পদ্ধতি কেবলমাত্র উযরবিহীন অবস্থান কার্যকর। তবে কারো যদি কোন উযর থাকে, তবে তা উযর হিসেবেই গণ্য হবে এবং তা মাকরূহ নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর পায়ে আঘাত থাকায় তিনি মাসনূন পদ্ধতিতে বসতে পারতেন না। কাজেই কখনো কখনো তিনি এরূপ বসতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ ধরনের বসাকে "তোমাদের নবীর সুন্নাত" বলে আখ্যায়িত করেছেন। একথার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কখনো উযরবশত হয়ত বা এরূপ বসে থাকবেন। অন্যথায় উযরবিহীন অবস্থায় সালাতে এরূপ বসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

١٠٧- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ فِىْ نَفْرٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَحْفَظُكُمْ لِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُهُ اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ اِسْتَوَا حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَنَصَبَ الْاُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ - رواه البخارى

১০৭. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একদল সাহাবীসহ আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) বলেন ঃ আমি আপনাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সালাত অধিক স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি যখন তাক্বীরে তাহ্রীমা বলতেন তখন দু'হাত দু'কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন রুকূ' করতেন দু'হাত দ্বারা দু'হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠকে কোমর ও ঘাড়ের সোজা রাখতেন। আর যখন মাথা উঠাতেন ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। যাতে (পিঠের) প্রত্যেকে গ্রন্থি স্ব-স্ব-স্থানে পৌঁছে যায়। তারপর যখন সিজ্দা করতেন তখন দু'হাত যমীনে না বিছিয়ে ও পেটের সাথে না মিশিয়ে (চেহারার পাশে রেখে কনুই উঁচু করে) এবং দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ কিবলামুখী করে রাখতেন। এরপর দুই রাক'আতের পর নিজের বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। এরপর শেষ রাক'আতে বাম পা বাড়িয়ে দিতেন, অপর পা খাড়া রাখতেন এবং নিতম্বের উপর বসতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) বর্ণিত হাদীসে তাক্বীরে তাহরীমার সময় কাঁধ বরাবর হাত উঠানোর কথা উল্লিখিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা) নামে এক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, " حتى يحاذى بها اذنيه " "তাক্বীরে তাহ্রীমার সময় তিনি তাঁর হাত উভয় কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন"। কিন্তু এ দুই বক্তব্য পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। কেননা যখন হাত কানের লতি বরাবর ওঠানো হয় তখন হাতের নিম্নভাগ মূলত কাঁধের বরাবর থাকে এবং পদ্ধতিকে কান পর্যন্ত আবার কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোও বলা যেতে পারে।

ওয়ায়িল ইব্ন হুজর (রা) নামে এক সাহাবী এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন। সুনানে আবূ দাউদে নিম্নবর্ণিত শব্দযোগে তার ভাষ্য বিবৃত হয়েছে ঃ

"رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى اِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ"

"তিনি তাক্বীরে তাহ্রীমার সময় তাঁর হাত এত দূর উঠাতেন যে, তা কাঁধ বরাবর হয়ে যেত এবং বৃদ্ধ আঙ্গুল দু'টি কান বরাবর করতেন।"

হযরত আবূ হুমায়দ সাঈদী (র) বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষ বৈঠকে 'তাওয়াররুক' পদ্ধতিতে বসতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত পূর্বে উল্লিখিত হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) এর হাদীসে প্রথম বৈঠক বসার যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যাকে 'ইফ্তিরাশ' বলে। তিনি সাধারণত শেষ বৈঠকে অনুরূপ বসতেন। কিছু সংখ্যক আলিম এবং ভাষ্যকার বলেন, হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাধারণভাবে ঠিক যেভাবে বসতেন। কিন্তু কখনো সহজ আবার কখনো জায়িয একথা বুঝানোর লক্ষ্যে তিনি 'তাওয়াররুক' করতেন। দ্বিতীয় অভিমত প্রথম অভিমতের সম্পূর্ণ উল্টা। আবার এও বলা যেতে পারে যে, উভয় পদ্ধতিই শরী'আতে স্বীকৃত।

কতিপয় বিশেষ যিক্র ও দু'আ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের বিভিন্ন অংশ যেমন দাঁড়ানো (কিয়াম) রুকূ এবং সিজ্দা অবস্থায় যে সকল বাক্যযোগে আল্লাহ্র গুণাগুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করতেন এবং যে সব দু'আ করতেন (যার কিছু সংখ্যক ইনশাআল্লাহ্ পাঠকগণ পরবর্তী হাদীস থেকে জানতে পারবেন) সে সবের কতিপয় বিশেষ যিক্র যা পাঠে অন্তরে এক বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হয় তা-ই হচ্ছে মূলতঃ সালাতের হাকীকত ও প্রাণ। এ হাদীসগুলো এ দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত অবস্থা অন্তরে সৃষ্টির লক্ষ্যে দু'আ পাঠ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই মহাসম্পদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উত্তারাধিকার।

١٠٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَأَةِ اِسْكَاتَةً فَقُلْتُ يَابِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَأَةِ مَا تَقُوْلُ ؟ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الابْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - رواه البخارى ومسلم

১০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলে কিরা'আত পাঠ করার পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব (চুপি চুপি কিছু পড়তেন) থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোন, আপনি তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ও কিরা'আতের মাঝে নীরব থেকে কী পাঠ করেন তা আমাকে অহিত করুন। তিনি বললেন, আমি বলি–

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ-

"হে আল্লাহ্! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ তুমি ব্যবধান করে দিয়েছ পূর্বও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেরূপ পরিষ্কার করা হয়ে থাকে সাদা কাপড় ময়লা থেকে। হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার পাপসমূহকে ধুয়ে ফেল বরফ, পানি ও শিলা (বৃষ্টির ন্যায় স্বচ্ছ পানি) দ্বারা"। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদিও যাবতীয় পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে পূতঃ পবিত্র ছিলেন। তথাপি আল্লাহ্‌র পরম নৈকট্য লাভের পরম আগ্রহ এবং মানবিক বিচ্যুতি ও পদস্খলন থেকে সর্বতোভাবে সংরক্ষিত থাকার লক্ষ্যে যাতে উত্তম মর্যাদার পরিপন্থী কিছু সংঘটিত না হয় এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ না ঘটে সে জন্য সদা সতর্ক থাকতেন। তাই তো বলা হয় قريبا رابيش بود جيرانى এবং جن كے رتبے ہيں سوا ان كو سوا مشكل ہے "যার মর্যাদা যত বেশী, তার পেরেশানী তত বেশী।" মোটকথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিভিন্ন দু'আয় যে خطايا অথবা ذنوب শব্দ এসেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য এরূপ মানবিক পদস্খলন ও বিচ্যুতি। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য হাদীসে যে দু'আ উল্লিখিত হয়েছে তার মূলকথা হচ্ছে এই যে, হে আল্লাহ্ ! প্রথমত তুমি আমাকে পাপাচার থেকে এই পরিমাণ দূরে রাখ যতদূর ব্যবধান রয়েছে পূর্ব থেকে পশ্চিমের এবং পশ্চিম থেকে পূর্বের। মানবিক দুর্বলতা বশতঃ যদি আমা হতে কোন প্রকার ত্রুটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তবে তুমি তা ক্ষমা করে দিয়ে তার দাগ এ ভাবে দূর করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা দূর করে ধবধবে সাদা করা হয়। আর নিজ রহমতের শীতল পানি দ্বারা আমার অভ্যন্তর ভাগ ধুয়ে দাও যাতে ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে সৃষ্ট তোমার ক্রোধের আগুন শীতল হয়ে যায় এবং তার স্থলে আমার অন্তরে তোমার সন্তুষ্টির শীতলতা ও প্রশান্তি নসীব হয়।

এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীরে তাহরীমা ও কিরা'আত পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে কখনো কখনো এই দু'আ পাঠ করতেন।

١٠٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ - رواه الترمذى وأبوداؤد

১০৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন বলতেন-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

"হে আল্লাহ্! তুমি মহাপবিত্র, তোমার জন্যই প্রশংসা, তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।" (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ হাফিয মাজদুদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়া (র) 'মুন্‌তাকা' গ্রন্থে সুনানে সাঈদ ইব্‌ন মানসূরের বরাতে হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে, সহীহ্ মুসলিমের বরাতে হযরত উমর (রা) সম্পর্কে এবং দারু কুতনীর বরাতে হযরত উসমান ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা সকলেই তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার পর سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ পাঠ করতেন। তাঁদের এ আমল থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার পর সাধারণত سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ পাঠ করতেন। তাই হাদীসে উদ্ধৃত অপরাপর দু'আ পাঠ করার

বলতেন ঃ "আমি এক নিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ করছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এ জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণ কারীদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ্! তুমিই বাদশাহ, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তুমি আমার প্রতিপালক আর আমি তোমার দাস, আমি আমার নিজের উপর যুলম করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত অপর কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে না, তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের উপর পরিচালিত কর। কেননা তুমি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি পাপ কাজ থেকে আমাকে দূরে রাখ। তমি ব্যতীত কেউ আমাকে তা থেকে দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত আছি এবং তোমার নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত আছি। সার্বিক কল্যাণ তোমারই হাতে নিবদ্ধ এবং কোন অকল্যাণই তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি বরকাতময়, তুমি সুউচ্চ মহান, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার অভিমুখী হচ্ছি।

যখন তিনি রুকূ' করতেন তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জন্য রুকূ করছি এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করছি। তোমার নিকট অবনমিত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার হাড় মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা উপশিরা। এরপর যখন মাথা উঠাতেন তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক! তোমার এমন প্রশংসা যা দিয়ে আসমান ও যমীনসমূহ এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে সকলেই পরিপূর্ণ। যখন সিজ্‌দা করতেন তখন বলতেন ঃ " হে আল্লাহ্ আমি তোমারই উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করছি এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করছি। আমার চেহারা তাঁকেই সিজ্‌দা করল যিনি তার স্রষ্টা, দান করেছেন উত্তম আকৃতি এবং কান ও চোখ। বরকতময় আল্লাহ্-শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা"। এর পর সর্বশেষে তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝে যা পাঠ করতেন তা এই যে, "হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর যা আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করব এবং যা আমি গোপনে করেছি আর যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি সীমাতিক্রম করেছি আর যা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ; তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।"(মুসলিম)

তুলনায় এ দু'আ পাঠ করাই উত্তম। যদিও আপরাপর বিশুদ্ধ দু'আ পাঠ করাও সঠিক। যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ " দু'আ এবং হযরত আলী (রা) কর্তৃক পাঠকৃত দু'আ যা সামনের হাদীসে আসবে।

١١٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَطَرَالسَّمٰوَاتِ وَالارْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَابِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ ، وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ، فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلأَالسَّمٰوَاتِ وَالارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَاِذَا سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - رواه مسلم-

১১০. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলতেন। তারঃপর তিনি " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰات والارض حنيفا وما انا من المشركين